আল্লাহর পরিচয় ও দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

আল্লাহর পরিচয়
ও
দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা-১০০০

ISBN : 984-842-022-3

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০০৪

প্রচ্ছদ
মুবাশ্‌শির মজুমদার

মুদ্রণ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

নির্ধারিত মূল্য : ষাট টাকা মাত্র

Allahar Parichay O Din Protishthar Proyas Written & Published |
AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Dhaka-10(
First Edition March 2004 Price Taka 60.00 only.

প্রধানত শিক্ষা শিবিরের আলোচনাকে ভিত্তি করে লিখেছিলাম কতগুলো পুস্তিকা। কোন কোন ভাই পরামর্শ দিচ্ছিলেন সেইগুলোকে একত্রিত করে একটু বড়ো আকারের বই রূপে ছাপতে। সেই পরামর্শেরই ফলশ্রুতি এই বই। আলকুরআন, আলহাদীস ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য পড়ে আমার যেই বুঝ সৃষ্টি হয়েছে সেই বুঝই আমি এই লেখাগুলোতে প্রকাশ করেছি।

এই লেখাগুলো যাঁদের ভালো লাগবে, তাঁদের নিকট দু'আর দরখাস্ত রইলো। কোথাও কোন ভুল থাকলে আমাকে জানালে বাধিত হবো।

আল্লাহ্ আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন।

– লেখক

সূচীপত্র

আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়।
আল্লাহর আব্বা নেই, আম্মা নেই।
আল্লাহর স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, কন্যা নেই।

আল্লাহ তখনো ছিলেন যখন আর কেউ ছিলো না, আর কিছু ছিলো না।
আল্লাহ তখনো থাকবেন যখন আর কেউ থাকবে না, আর কিছু থাকবে না।
অর্থাৎ আল্লাহ চিরকাল ছিলেন, চিরকাল আছেন, চিরকাল থাকবেন।
আল্লাহ ধ্বংসের উর্ধে।
আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল।

আল্লাহর ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই।
আল্লাহ কিছু খান না।
আল্লাহ কিছু পান করেন না।

আল্লাহর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই।
আল্লাহ অন্যমনস্ক হন না।
আল্লাহ কিছু ভুলে যান না।

আল্লাহকে কোন সৃষ্টি দেখতে পায় না।
কিন্তু সকল কিছু তাঁর দৃষ্টির অধীন।
আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে কোন কিছুই থাকা সম্ভব নয়।
আল্লাহ একই সময়ে মহাবিশ্বের সকল প্রাণী, বস্তু ও শক্তি (energy) দেখতে পান।

আল্লাহ সব কিছুই শুনেন।
মহাবিশ্বের সর্বত্র উচ্চারিত প্রতিটি কথা ও উত্থিত প্রতিটি আওয়াজ তিনি একই সময়ে শুনতে পান।
আল্লাহ একচ্ছত্র সম্রাট।
মহাবিশ্ব আল্লাহর সাম্রাজ্য।

এই সাম্রাজ্যের মালিকানায় ও পরিচালনায় তাঁর কোন অংশীদার নেই।
আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।
প্রতিটি প্রাণী, বস্তু ও শক্তি (energy) অস্তিত্ব লাভের জন্য ও টিকে থাকার জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।
মহাবিশ্বের সর্বত্র তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ মহাজ্ঞানী।
আল্লাহর জ্ঞান সীমাহীন।
আল্লাহ সর্ব শক্তিমান।
আল্লাহর শক্তি সীমাহীন।
আল্লাহ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা।
আল্লাহর সৃষ্টি-ক্ষমতার শেষ নেই।

আল্লাহ জীবন দেন।
আল্লাহ মৃত্যু দেন।
আল্লাহ জীবিত থেকে মৃতকে এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন।

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো ওপর বিপদ-মুসীবাত আসতে পারে না।

আল্লাহর ক্ষমতা অ-প্রতিরোধ্য।
আল্লাহ যদি কারো কল্যাণ করতে চান তাতে বাধ সাধবার শক্তি কারো নেই।
আল্লাহ যদি কারো অ-কল্যাণ করতে চান তা প্রতিরোধ করার শক্তি কারো নেই।

আল্লাহ সর্ব-বিজয়ী, মহা পরাক্রমশালী।
আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী।
আল্লাহ মহাবিজ্ঞ।

আল্লাহ পরম দয়ালু, করুণাময়।
আল্লাহ শাস্তি দাতাও।
আল্লাহর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।
আল্লাহ সার্বভৌম সত্তা।
আদেশ-নিষেধের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁর।
আল্লাহর বিধানই চূড়ান্ত আইন।

আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন।
আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করতে পারেন, করেন।
আল্লাহ কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে বলেন "হও", আর অমনি তা হয়ে যায়।
আল্লাহ শূন্য থেকে বা অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করতে পারেন।

আল্লাহ যা করেন তার জন্য কারো কাছে জওয়াবদিহি করতে হয় না।
অন্য সবাইকে তাঁর নিকট জওয়াবদিহি করতে হয়।

আল্লাহ সকল মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ সকল যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর স্রষ্টা।
তিনি শ্রেণী মতো পরমাণুগুলোকে সংযুক্ত কিংবা সংমিশ্রিত করে বিভিন্ন বস্তুসত্তার অস্তিত্ব গড়ে তোলেন।

আল্লাহ প্রথমে আসমান ও পৃথিবীকে যুক্ত অবস্থায় সৃষ্টি করেন, পরে এইগুলোকে পৃথক করে দেন।

আল্লাহ সময়ের ছয়টি অধ্যায়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে আরশে সমাসীন হয়েছেন।
আল্লাহ মহাবিশ্বকে সাতটি স্তর বা অঞ্চলে বিন্যস্ত করেছেন।

আল্লাহর নির্দেশেই আসমান ও পৃথিবী সু-প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।
আল্লাহ মহাকর্ষ বল (Gravitation) সৃষ্টি করে এর দ্বারা মহাবিশ্বের সকল কিছুকেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছেন।
আল্লাহ মহাবিশ্বের সকল কিছুর আকার, আয়তন ও গতিপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।
আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করে প্রত্যেকটিকে তার করণীয় জানিয়ে দিয়েছেন।
আসমান ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর ফরমানের অধীন।
আল্লাহ সূর্য ও চাঁদকে এমন নিয়মের অধীন করে রেখেছেন যার ফলে পৃথিবীতে একের পর এক বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব ঘটে, রাত দিনের আবর্তন ঘটে এবং মানুষ মাস ও বছরের হিসাব রাখতে পারে।

আল্লাহ আলো সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ আঁধার সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ ছায়া সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ পৃথিবী-পৃষ্ঠে পাহাড়-পর্বত গেড়ে দিয়েছেন যাতে পৃথিবী আপন পথে চলতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে হেলে দুলে না পড়ে।

আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠকে বাসোপযোগী ও আবাদযোগ্য বানিয়েছেন।

আল্লাহ পৃথিবীর চারদিকে বায়ুর একটি পুরু বেষ্টনী সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ ঘনীভূত অক্সিজেনময় ওজোন (ozone) স্তর সৃষ্টি করে তেজস্ক্রিয় মহাজাগতিক রশ্মিকে ভূ-পৃষ্ঠে পৌছতে বাধাগ্রস্ত করেছেন।

আল্লাহ পৃথিবীকে মাটি সম্পদ, বন-সম্পদ, ঘাস-সম্পদ, উদ্ভিদ সম্পদ, লতা-গুল্ম সম্পদ, পানি সম্পদ, সামুদ্রিক উদ্ভিদ সম্পদ, মাছ সম্পদ, পাখি সম্পদ, পশু সম্পদ, তাপ-বিদ্যুৎ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি সম্পদে ভরপুর করেছেন।
আল্লাহ মাটির গভীরে সোনা, রূপা, হীরা, লোহা, তামা, কয়লা, পেট্রোল, গ্যাস ইত্যাদি সম্পদ মওজুদ করে রেখেছেন।
আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠে গাছ-গাছালির খাদ্য হবার উপযোগী বহু জৈবিক উপাদান মওজুদ করে রেখেছেন।
আল্লাহ পৃথিবীর মাটিকে শস্য ফলানো, শাক-সবজি ফলানো, গাছ জন্মানো ও নানা প্রকারের গাছে নানা আকারের নানা রঙের নানা স্বাদের ফল ফলানোর উপযোগী বানিয়েছেন।

আল্লাহ পৃথিবীর বুকে নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগর সৃষ্টি করে সেইগুলোকে পানির রিজার্ভারে পরিণত করেছেন।
আল্লাহ নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগরকে অফুরন্ত মাছ সম্পদে পরিপূর্ণ করেছেন।
আল্লাহ সাগর-মহাসাগরের গভীরে বিচিত্র ধরনের প্রাণী, মণি-মুক্তা, সৌন্দর্য-শোভার অন্যান্য উপকরণ ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ মওজুদ করে রেখেছেন।
আল্লাহ পানি সৃষ্টি করেছেন এবং এটিকে যমীনকে সিক্ত করা, প্রাণীর পিপাসা মেটানো ও দানা-বীজকে অংকুরিত করার গুণ দান করেছেন।

আল্লাহ আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং এটিকে তাপ ও আলো বিতরণের গুণ দান করেছেন।

আল্লাহ বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্টি করেছেন এবং এটিকে বিভিন্ন যন্ত্র চালানো ও বালবের ভেতর সঞ্চালিত হয়ে আলো ছড়ানোর গুণ দান করেছেন।

আল্লাহ পানি থেকে বাষ্প, বাষ্প থেকে মেঘ ও মেঘ থেকে বৃষ্টি সৃষ্টি করেন।
আল্লাহর নির্দেশে বায়ু প্রবাহিত হয়, বায়ুতে ভর করে মেঘ দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে ও মেঘ থেকে বৃষ্টি নামে।

আল্লাহ খাদ্য দ্রব্যে মানুষের দেহ পুষ্ট করার গুণ দান করেছেন।
আল্লাহ মধুসহ বিভিন্ন দ্রব্যে রোগ নিরাময়ের গুণ দান করেছেন।

আল্লাহ নূর থেকে ফিরিশতাদের সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে তাঁর অবাধ্যতা করার ক্ষমতা দেননি।
ফিরিশতারা আল্লাহর বিশ্বস্ত অনুগত কর্মচারী।

আল্লাহ আগুন থেকে জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ জিনদেরকে তাঁর আনুগত্য করার কিংবা অবাধ্যতা করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

আল্লাহ মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ মানুষদেরকে তাঁর আনুগত্য করার কিংবা অবাধ্যতা করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

আল্লাহ জিন ও মানুষদেরকে তাঁর আনুগত্য করার পুরস্কার ও অবাধ্যতা করার শাস্তি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ মানুষ, বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ ও বিদ্যুৎ কণা ইত্যাদির জুড়ি সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ প্রথম মানুষ আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া (রা) থেকে মানুষের বংশধারা চালু করেছেন।
আল্লাহ মানুষকে পুরুষ ও নারী রূপে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারে এবং সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির আসল দুর্গ পরিবার সংগঠন গড়ে তুলতে পারে।
আল্লাহ পুরুষকে দুর্ধর্ষতা, সাহসিকতা, ক্ষিপ্রতা ও কঠোরতার আধিক্য দান করেছেন।
আল্লাহ নারীকে নম্রতা, মায়া-মমতা ও সৌন্দর্যানুভূতির আধিক্য দান করেছেন।

আল্লাহ নির্দিষ্ট সংখ্যায় মানুষ ও নির্দিষ্ট পরিমাণে সম্পদ সৃষ্টি করে থাকেন।
আল্লাহ সকল মানুষ ও অন্যান্য সকল প্রাণীর রিয্কের ব্যবস্থা করে থাকেন।

আল্লাহ মানুষকে অভাবের আশংকায় সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।
আল্লাহ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যা যা প্রয়োজন সবই সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ পৃথিবীর সম্পদ-সম্ভার মানুষের ভোগ-ব্যবহারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহর সৃষ্ট নিয়ামাতগুলো গণনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।
আল্লাহ কাউকে বেশি অর্থ-সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন।
আল্লাহ কাউকে কম অর্থ-সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন।

আল্লাহই মানুষের আকৃতি, গায়ের রঙ, ভাষা, কণ্ঠস্বর, চলনভংগি ইত্যাদির পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ জীবকুলের মধ্যে মানুষকে সবচে' বেশি জ্ঞান দান করেছেন। তবে জ্ঞানময় আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এই জ্ঞান খুবই সামান্য।

আল্লাহ মানুষকে রূহ দান করেছেন।
আল্লাহ যদ্দিন রূহকে মানুষের মাঝে অবস্থান করতে দেন তদ্দিনই মানুষ জীবিত থাকে।

আল্লাহ মানুষকে মস্তিষ্ক দান করেছেন।
আল্লাহ এটিকে চিন্তা-ভাবনা করা, পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করা, বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা তৈরি করা ও বহু কিছু উদ্ভাবন করার যোগ্যতা দান করেছেন।

আল্লাহ মানুষকে হৃদপিণ্ড দান করেছেন।
আল্লাহর নির্দেশে এটি ছন্দবদ্ধভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে দেহের সর্বত্র রক্ত-সঞ্চালনের কর্তব্য পালন করে।

আল্লাহ মানুষকে ফুসফুস দান করেছেন।
আল্লাহর নির্দেশে এটি ছন্দময় প্রক্রিয়ায় রক্তে অক্সিজেন ঢুকানো ও রক্ত থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরানোর কর্তব্য পালন করে।
আল্লাহ মানুষকে একজোড়া কিডনি দান করেছেন। এরা পানিকে পরিস্রুত করে রক্ত-রসে পরিণত করা ও অ-প্রয়োজনীয় পানিকে বের করে দেয়ার কর্তব্য পালন করে।

আল্লাহ মানুষকে পাকস্থলি দান করেছেন।
এটি আহার্য দ্রব্য হজম করে দেহ পরিপোষণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ যকৃত (লিভার) দান করেছেন। এটি পিত্ত ক্ষরণ করে পিত্তথলিতে জমা রাখে ও বিশেষ বিশেষ খাদ্যকে পরিপাকের পর রক্ত স্রোতে পাঠানোর কর্তব্য পালন করে।

আল্লাহ গোটা দেহে বহু সংখ্যক হাড়, পেশী, কোষ, কলা, অন্ত্র, ঝিল্লি, গ্রন্থি ইত্যাদি দান করেছেন যেইগুলো দেহকে সজীব, সুস্থ, সবল রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে বায়ু পাখিদেরকে উড়তে ও মানুষকে প্লেনে চড়ে দ্রুত দেশ-বিদেশে পৌঁছতে সাহায্য করে।

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগরের পানি জাহাজগুলোকে ভাসিয়ে রাখে যাতে মানুষ দূর দূর স্থানে পৌঁছতে ও মালসামগ্রী আমদানী-রফতানী করতে পারে।

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে বাষ্প বিভিন্ন মেশিনে শক্তি সঞ্চালন করে যাতে বিভিন্ন যানে চড়ে মানুষ দ্রুত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারে।

আল্লাহ মানুষকে চিন্তাশক্তি দান করেছেন।
আল্লাহ মানুষকে দেখার শক্তি দান করেছেন।
আল্লাহ মানুষকে লেখার শক্তি দান করেছেন।
আল্লাহ মানুষকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন।
আল্লাহ মানুষকে শুনার শক্তি দান করেছেন।
আল্লাহ মানুষকে ধরার শক্তি দান করেছেন।
আল্লাহ মানুষকে চলার শক্তি দান করেছেন।
আল্লাহ মানুষকে বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনের শক্তি দান করেছেন।

আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও কর্ম-প্রচেষ্টার স্বাধীনতা দান করেছেন।
আল্লাহ মানুষকে অসংখ্য সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দান করেছেন।
আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদাতের (উপাসনা-দাসত্ব-আদেশানুবর্তিতার) জন্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ একমাত্র মানুষকেই তাঁর খালীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে খিলাফাত (আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল শাসন) কায়েম করে পূর্ণাংগ ইবাদাতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব দিয়েছেন।

আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ইসলাম।
আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান নির্ভুল, পূর্ণাংগ, ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণময়।
আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে এমন জীবন বিধান রচনা করা সম্ভব নয়।
আল্লাহ নবী-রাসূলদের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা মানুষের নিকট পেশ করেছেন।
আল্লাহ প্রথম মানুষ আদমকে (আ) প্রথম নবী বানিয়েছেন।
আল্লাহ যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন যাতে তাঁরা মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত (উপাসনা-দাসত্ব-আদেশানুবর্তিতা) এবং তাগুতের (আল্লাহদ্রোহী শক্তির) বিরোধিতা করার শিক্ষা দেন।
আল্লাহ সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদের (সা) প্রতি সর্বশেষ আসমানী কিতাব আলকুরআন নাযিল করেছেন।
আল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) আলকুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন।
আল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) আলকুরআনের প্রায়োগিক রূপ শিক্ষা দেবার দায়িত্ব দিয়েছেন।
আল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) অনুসরণকে তাঁর ভালোবাসা পাওয়ার শর্ত বানিয়েছেন।

আল্লাহ মানুষকে খালীফার (প্রতিনিধির) মর্যাদা দেয়ায় হিংসা-কাতর ইবলীস ও তার অনুসারীরা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা চালাবার শপথ নেয়।
আল্লাহ ঘোষণা করেন যে যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে চলবে ইবলীস ও তার অনুসারীরা তাদের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

আল্লাহ অলৌকিকভাবে কোন ভূ-খণ্ডে তাঁর জীবন বিধান চালু করেন না।
আল্লাহ জোর করে তাঁর জীবন বিধান কোন জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেন না।
আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যদি তারা তাদের চিন্তাধারা ও কর্মধারা পরিবর্তন না করে।

আল্লাহ চান, মানুষ স্বেচ্ছায় তাঁর দেয়া জীবন বিধান তাদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনে কায়েম করুক।

আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল শাসন কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ শূরা বা পরামর্শ ভিত্তিক শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ যেই কোন মূল্যে সুবিচার নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ অর্থ-সম্পদের অবাধ আবর্তন, সুষম বণ্টন ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সুদমুক্ত ও যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ সালাত বা নামায কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ সাউম বা রোযা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ বিত্তবানকে যাকাত দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ বিত্তবানকে হাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাঁর পথে অকাতরে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ আব্বা-আম্মা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অপরাপর মানুষের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ আইনের দাবি ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ অন্যের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ আমানাতের খিয়ানাত করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ মাপ ও ওজনে ঠকাতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ সুদ, ঘুষ, জুয়া ও মওজুদদারী নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ চুরি-ডাকাতি নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ অপব্যয়-অপচয় নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ যুল্‌ম-অত্যাচার নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ অহংকার নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ রিয়া নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ গীবাত নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ অপবাদ নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ মিথ্যা কথা বলা নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ গান-বাজনা নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ প্রাণীর ছবি আঁকা নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ সকল প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীল কাজ নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ প্রবৃত্তির আনুগত্য নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ আম্মা, দুধ মা, খালা, ফুফু, বোন, দুধ বোন, কন্যা, স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরশজাত কন্যা, ভাতিঝি, ভাগিনী, শ্বাশুড়ী, পুত্রবধূ, একত্রে দুই বোন, একত্রে ফুফু-ভাইঝি এবং একত্রে খালা-বোনঝিকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ মুশরিক নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ সামাজিক পবিত্রতা ও সুস্থতার জন্য আল হিজাব বা পর্দার বিধান নাযিল করেছেন।

আল্লাহ মদ ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ শর নিক্ষেপ করে ভাগ্য গণনা নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ গণকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ মরা পশুর গোশত, শূকরের গোশত, রক্ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাইকৃত পশু, কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আহত হয়ে ওপর থেকে পড়ে মৃত পশু, হিংস্র জন্তু কর্তৃক নিহত পশু এবং কোন বেদীতে উৎসর্গীকৃত পশুর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন।
আল্লাহ নখরযুক্ত ও হিংস্র জন্তু খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ জ্ঞান অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন।
আল্লাহ আলকুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।
আল্লাহ মহাবিশ্বকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণার নির্দেশ দিয়েছেন।
আল্লাহ হালাল জীবিকা অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ একমাত্র তাঁকে ভয় করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।
আল্লাহ্ একমাত্র তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ সকল নেক কাজ একমাত্র তাঁর সন্তোষ হাছিলের অভিপ্রায়ে (নিয়াতে) সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এটা আল্লাহর অধিকার যে মানুষ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে।
এটা আল্লাহর অধিকার যে মানুষ একনিষ্ঠভাবে তাঁর নির্দেশগুলো মেনে চলবে।
এটা আল্লাহর অধিকার যে মানুষ আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার করবে।
এটা আল্লাহর অধিকার যে মানুষের সকল ত্যাগ-কুরবানী একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত হবে।
এটা আল্লাহর অধিকার যে মানুষের মাথা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নত হবে।
এটা আল্লাহর অধিকার যে মানুষ একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে।
এটা আল্লাহর অধিকার যে মানুষ একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করবে।
এটা আল্লাহর অধিকার যে মানুষ আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আনুগত্য মেনে নেবে না।
এটা আল্লাহর অধিকার যে মানুষ একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করবে।
এটা আল্লাহর অধিকার যে মানুষ আল্লাহকেই সবচে' বেশি ভালোবাসবে।
এটা আল্লাহর অধিকার যে মানুষ তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্যই করবে।

যেই জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের নিরিখে তাদের গোটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে আল্লাহ তাদের জন্য আসমান ও পৃথিবীর বারাকাতের দুয়ার খুলে দেন।
অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে প্রভূত কল্যাণ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করেন।

আল্লাহ্ তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেন।

আল্লাহ্ তাঁর না-ফরমান বান্দাদেরকে পেরেশানী-যুক্ত জীবিকা দেন।
আল্লাহ্ মানুষকে ইচ্ছা ও কর্ম-প্রচেষ্টার স্বাধীনতা দিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন।
যেই ব্যক্তি আল্লাহর আদেশানুবর্তী জীবন যাপন করে সে কামিয়াব।
যেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করে সে ব্যর্থ।

আল্লাহ নিজেই সকল মানুষের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছেন।
আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির সংগে দুইজন ফিরিশতাকে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন।
আল্লাহর নির্দেশে ফিরিশতারা অবিরাম মানুষের সকল তৎপরতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে চলছেন।
আল্লাহ মানুষকে দুর্বল রূপে সৃষ্টি করেন, যৌবনে তাকে শক্তিমান করেন, বার্ধক্যে আবার তাকে দুর্বলতার শিকারে পরিণত করেন।
আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেই নির্দিষ্ট ক্ষণেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।
দুর্ভেদ্য দুর্গের ভেতর লুকিয়েও মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

আল্লাহ বর্তমান মহাবিশ্বকে অনন্তকালের জন্য সৃষ্টি করেননি।
আল্লাহ বর্তমান বিশ্ব-ব্যবস্থাকে ভেংগে দেয়ার জন্য একটি দিন-ক্ষণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।
আল্লাহর নির্দেশে সেই দিন অন্যতম ফিরিশতা ইসরাফীল (আ) তাঁর বিশাল শিংগায় ফুঁ দেবেন।
শিংগার আওয়াজ উত্থিত হওয়ার সংগে সংগে আসমান ও পৃথিবী থরথর করে কেঁপে উঠবে।
আল্লাহ যেই মহাকর্ষ বলের (Gravitation) দ্বারা মহাবিশ্বের সব কিছুকেই পরস্পর সম্পর্কিত রেখেছেন তা ছিন্ন করে দেবেন।
কোটি কোটি তারকা, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু ইত্যাদি সব কিছু ছিটকে পড়বে। পাহাড়-পর্বত টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকবে। সাগরগুলো উৎক্ষেপিত হবে। আসমান, পৃথিবী ও এদের মধ্যকার সব কিছু ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে।
সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।
একমাত্র আল্লাহই বিদ্যমান থাকবেন।

অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে নতুন আকারে, নতুন বিন্যাসে মহাবিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করবে।
আল্লাহর নির্দেশে বড়ো আকারে নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে।
নতুন পৃথিবী হবে এক বিশাল, সমতল, ধূসর প্রান্তর। 'আলকাউসার' নামে একটি জলাধার ছাড়া আর কিছু থাকবে না সেই সুবিস্তৃত ময়দানে।
আল্লাহর অনুগ্রহে আলকাউসারের পানি হবে দুধের মতো সাদা ও মিসকের চেয়েও বেশি সুগন্ধযুক্ত।

আল্লাহ প্রতিটি গলিত লাশের পরমাণুগুলোর কোনটি কোথায় অবস্থান করে একটি কিতাবে তার বিবরণ সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ মাটিতেই মানুষকে ফিরিয়ে নেন।
আল্লাহ এই মাটি থেকেই মানুষকে জীবিত করে উঠাবেন।

আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফীল (আ) আবার শিংগায় ফুঁ দেবেন।
আল্লাহর নির্দেশে সকল মানুষ জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে এবং বিস্ময়ভরা চোখে এদিক ওদিক তাকাতে থাকবে।
আল্লাহর নূর পৃথিবীময় ঝলমল করতে থাকবে।
প্রচণ্ড উত্তাপে ও আতংকে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়বে।
আল্লাহর অনুগত বান্দারা 'আলকাউসারের' সুমিষ্ট ও শীতল পানি পান করে পিপাসা দূর করবে। যারা দুনিয়ায় আল্লাহর অবাধ্যতা করেছে তাদেরকে আলকাউসারের' কাছে ঘেঁষতে দেয়া হবে না।

আল্লাহর আদালতে সারিবদ্ধভাবে মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে।
একদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবেন ফিরিশতারা।
আল্লাহর নির্দেশে যেইসব ফিরিশতা মানুষের তৎপরতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁরা তা পেশ করবেন।
আল্লাহর নির্দেশে প্রত্যেকের হাতে প্রত্যেকের আমলনামা তুলে দেয়া হবে।
আল্লাহর অনুগত বান্দারা ডান হাতে তাদের আমলনামা গ্রহণ করবে।
আল্লাহর অবাধ্য বান্দারা হাত পেছনে নিয়ে গেলেও আমলনামা হাতে নিতে বাধ্য হবে।
আল্লাহ ঘোষণা করবেন : 'তোমার আমলনামা পড়'।
প্রত্যেক ব্যক্তি দেখতে পাবে তার কৃত প্রতিটি কাজের বিবরণ নিখুঁতভাবে নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আল্লাহ মানুষকে তার জীবনকাল সে কিভাবে কাটিয়েছে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।
আল্লাহ মানুষকে তার দেহসত্তায় যেইসব শক্তি দান করেছেন সেইগুলোর ব্যবহার (use) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

আল্লাহ মানুষকে যেই জ্ঞান দান করেছেন তার ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।
আল্লাহ মানুষকে যেইসব অর্থ-সম্পদ দান করেছেন তার ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।
আল্লাহ মানুষকে যেইসব ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়েছেন সেইগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।
আল্লাহ মানুষকে যেইসব আদেশ-নিষেধ করেছেন সেইগুলোর পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।
আল্লাহ মানুষকে অপরাপর মানুষের তত্ত্বাবধান করার যেই দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

আল্লাহর নির্দেশে মানুষের হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে তাদেরকে কোন্ কোন্ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।
আল্লাহর নির্দেশে মানুষের জিহ্বা, কান, চোখ ও ত্বক সাক্ষ্য দেবে তাদেরকে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।
আল্লাহর নির্দেশে মানুষের অন্তর সাক্ষ্য দেবে কখন কোন্ চিন্তা তার মাঝে লালিত হয়েছে।

মানুষের দুনিয়ার জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের চুলচেরা বিশ্লেষণের পর আল্লাহ যাদেরকে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেবেন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেবেন।
আল্লাহ যাদেরকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেবেন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেবেন।

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর কাছে কারো মুক্তির জন্য শাফাআত বা সুপারিশ করতে পারবেন না।
আল্লাহ যাঁকে শাফাআত করার অনুমতি দেবেন তিনি কেবল ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে শাফাআত করতে পারবেন যার জন্য শাফাআত করার অনুমতি দেয়া হবে।
আল্লাহর অনুমতিক্রমে নবী-রাসূল, শহীদ ও তাঁর অন্যান্য প্রিয় বান্দারা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য শাফাআত করলে আল্লাহ অনুগ্রহ করে তা কবুল করবেন এবং তাদের মুক্তির নির্দেশ দেবেন।

এক পর্যায়ে জাহান্নামীরা প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী আদমের (আ) নিকট জড়ো হয়ে তাদের মুক্তির জন্য শাফাআত করার অনুরোধ জানাবে। তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন।

তারা ছুটে যাবে নূহের (আ) কাছে। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন।

তারা ছুটে যাবে ইবরাহীমের (আ) কাছে। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন।

তারা ছুটে যাবে মূসা ইবনু ইমরানের (আ) কাছে। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন।

তারা ছুটে যাবে ঈসা ইবনু মারইয়ামের (আ) কাছে। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন।

তারা ছুটে যাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে।

তিনি সাজদায় পড়ে আল্লাহর তাসবীহ করতে থাকবেন।

আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ তিনি সাজদারত থাকবেন।

আল্লাহর অনুমতিক্রমে তিনি একদল লোকের নাজাতের জন্য শাফাআত করবেন।

আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাঁর শাফাআত কবুল করবেন।

আল্লাহর নির্দেশে তিনি নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আরো কিছু লোকের জন্য শাফাআত করার অনুমতি লাভের জন্য আবার সাজদায় লুটিয়ে পড়বেন।

আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ তিনি সাজদায় থাকবেন।

আল্লাহর অনুমতিক্রমে তিনি আরো একদল লোকের জন্য শাফাআত করবেন।

আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাঁর শাফাআত কবুল করবেন।

আল্লাহর নির্দেশে তিনি সেই লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) বারবার সাজদারত হয়ে শাফাআতের অনুমতি চাইতে থাকবেন। আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাঁকে একের পর এক বহু সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার অনুমতি দেবেন।

আল্লাহ সর্বশেষে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) যাদের অন্তরে সরিষার বীজের পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার অনুমতি দেবেন।

জাহান্নামীরা জাহান্নামে ও জান্নাতীরা জান্নাতে অবস্থান গ্রহণের পর একজন ফিরিশতা মধ্যবর্তী স্থান থেকে ঘোষণা করবেন : 'ওহে জাহান্নামীরা, আর মৃত্যু নেই। ওহে জান্নাতীরা, আর মৃত্যু নেই। সামনে অনন্ত জীবন।'

জাহান্নাম কঠিন শাস্তির স্থান।

আল্লাহ ভয়ংকর আকৃতির ফিরিশতাদেরকে জাহান্নামীদের শাস্তির জন্য নিযুক্ত করে রেখেছেন।

আল্লাহর নির্দেশে ফিরিশতারা অপরাধীদেরকে গলায় বেড়ি ও দেহে লোহার শিকল পেঁচিয়ে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। জাহান্নামীদেরকে আলকাতরার পোশাক পরানো হবে।

আল্লাহ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি তেজযুক্ত আগুন দিয়ে জাহান্নাম ভরে রেখেছেন।

ঘন শ্বাসরুদ্ধকর ঝাঁঝালো কষ্টদায়ক ধোঁয়া জাহান্নামে আবর্তিত হতে থাকবে।

আল্লাহ জাহান্নামের বিভিন্ন অংশ বিশাল আকৃতির ভয়ংকর বিষধর সাপ দিয়ে ভর্তি করে রেখেছেন।

আল্লাহ জাহান্নামীদের দেহকে বিশাল আকৃতি দেবেন।

ফিরিশতারা ভারী গুর্জ দিয়ে আঘাত হেনে জাহান্নামীদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবেন।

জাহান্নামীরা ভীষণ চিৎকার করতে থাকবে।

আগুনের উত্তাপে ও পিপাসায় তারা হাঁপাতে থাকবে।

জাহান্নামীদেরকে তাদের দেহ-নির্গত রক্ত-পুঁজ পান করতে দেয়া হবে।

টগবগ করে ফুটছে এমন পানি তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে।

উত্তপ্ত তেলের গাদ তাদেরকে পান করানো হবে।

জাহান্নামীদেরকে কাঁটাযুক্ত, তিক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত যাক্কুম গাছ গিলতে বাধ্য করা হবে।

জাহান্নামীদের গায়ের চামড়া পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে, নতুন চামড়া জন্মাবে ও নতুনভাবে পুড়তে থাকবে।

আল্লাহ জাহান্নামে আরো বহুবিধ শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

জাহান্নামে সবচে' কম শাস্তি যাকে দেয়া হবে তাকে আগুনের ফিতাযুক্ত একজোড়া জুতা পরানো হবে। এতে তার মাথার মগজ চুলার ওপর হাঁড়ির পানির মতো টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

জান্নাত অনাবিল সুখ-শান্তির স্থান।

আল্লাহ তাঁর আদেশানুবর্তী বান্দাদেরকে মেহমানের মর্যাদা দেবেন।

আল্লাহর নির্দেশে ফিরিশতারা তাঁদেরকে সাদর-সম্ভাষণ জানিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

আল্লাহ সবচে' কম মর্যাদাবান জান্নাতীকে বর্তমান পৃথিবীর চেয়ে দশগুণ বেশি স্থান দান করবেন।

আল্লাহ জান্নাতকে নয়নাভিরাম বাগানময় করে রেখেছেন।

আল্লাহ জান্নাতের বাগানগুলোকে পাখ-পাখালিতে পূর্ণ করে রেখেছেন।

আল্লাহ জান্নাতকে ফুলে ফুলে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন।

আল্লাহর নির্দেশে জান্নাতে সুপেয় পানির ঝর্ণা, সুস্বাদু দুধের ঝর্ণা, স্বচ্ছ মধুর ঝর্ণা ও অন্যান্য উন্নত মানের পানীয়র ঝর্ণা অবিরাম প্রবাহিত হচ্ছে।

আল্লাহ জান্নাতে অতি সুস্বাদু মাছ, গোশত, রকমারি খাদ্য ও ফলের সমারোহ ঘটিয়েছেন।

আল্লাহ জান্নাতে অনুপম উপদানে তৈরি সুউচ্চ, সুবিস্তৃত ও সুদৃশ্য প্রাসাদ সারি সজ্জিত করে রেখেছেন।

আল্লাহ জান্নাতের প্রাসাদগুলোর মেঝেকে অতি উচ্চমানের পুরু কার্পেটে সজ্জিত করেছেন।

আল্লাহ জান্নাতীদের জন্য অতীব সুন্দর ও অতীব আরামদায়ক পোশাক মওজুদ করে রেখেছেন।

আল্লাহ জান্নাতীদের জন্য অতীব আরামদায়ক আসন ও শয্যার ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ জান্নাতকে আলো-ঝলমল করে রেখেছেন।

আল্লাহ জান্নাতকে অগণিত সৌন্দর্য-শোভার উপকরণে সজ্জিত করে রেখেছেন।

আল্লাহ জান্নাতের প্রতিটি বস্তুকে তুলনাহীন সুঘ্রাণ যুক্ত করে রেখেছেন।

আল্লাহ জান্নাতকে উত্তাপ ও শীতের প্রকোপ মুক্ত করে গড়েছেন।

আল্লাহ জান্নাতের সব কিছু জান্নাতীদের নাগালের মধ্যেই রেখেছেন।

আল্লাহ জান্নাতীদের খিদমাতের জন্য গিলমান (চির বালকদল) মুতায়েন করে রেখেছেন।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে জান্নাতী হলে আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতেও অনন্তকালের জন্য জীবন-সাথী বানিয়ে দেবেন।

আল্লাহ জান্নাতে পুরুষদেরকে হুরও দেবেন।

আল্লাহ জান্নাতীদেরকে ষাট হাত দৈর্ঘ্য দান করবেন।

আল্লাহ জান্নাতীদেরকে চির যুবক ও চির যুবতী বানাবেন।

আল্লাহ জান্নাতীদেরকে কখনো বুড়ো হতে দেবেন না।

আল্লাহ জান্নাতীদেরকে চিরকাল রোগমুক্ত রাখবেন।

আল্লাহ জান্নাতীদেরকে যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক অশান্তি মুক্ত রাখবেন।
আল্লাহ জান্নাতীদেরকে অসাধারণ দৈহিক সৌন্দর্য দান করবেন।
আল্লাহ জান্নাতীদেরকে অসাধারণ সুঘ্রাণযুক্ত করবেন।
আল্লাহ জান্নাতে এক বিশাল মার্কেট বানিয়ে রেখেছেন যেখানে প্রতি জুমাবার জান্নাতী পুরুষেরা একত্রিত হবেন।
সেখানে প্রবাহিত হাওয়ার ছোঁয়ায় তাঁদের রূপ-সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁদের পোশাক থেকে নতুন সুগন্ধ বের হতে থাকবে।
তাঁরা তাঁদের প্রাসাদে ফিরে তাঁদের স্ত্রীদেরকেও পূর্বের চেয়ে আরো বেশি রূপ-লাবণ্যে ভরা দেখতে পাবেন।
আল্লাহ জান্নাতীদেরকে এমন ক্ষমতা দেবেন যে হাজারো মাইল দূরে অবস্থিত ব্যক্তিকে তাঁরা দেখতে চাইলে দেখতে পাবেন এবং কথা বলতে চাইলে বলতে পারবেন।
আল্লাহ এমন এমন বৃক্ষ তৈরি করে রেখেছেন যার একটির শাখা-প্রশাখার নীচে একজন অশ্বারোহী একশত বছর অশ্ব চালনা করেও তার সীমানা অতিক্রম করতে পারবেন না।
আল্লাহ জান্নাতীদের জন্য এমন বাহন মওজুদ করে রেখেছেন যাতে আরোহণ করে তাঁরা গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করতে পারবেন।
[সম্ভবত জাহান্নামের অংশটুকু ছাড়া মহাবিশ্বের বাকি অংশকে জান্নাতে রূপান্তরিত করা হবে।]
আল্লাহ পৃথিবীটাকেও জান্নাতের অংশ বানিয়ে দেবেন।
একজন জান্নাতী যা চাইবেন তা-ই পাবেন।
আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে আরো অনেক কিছু দেবেন।
আল্লাহ জান্নাতে এমন সব নিয়ামাত মওজুদ করে রেখেছেন যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, যার কথা কোন কান কখনো শুনেনি এবং যার ধারণা কোন হৃদয়ে কখনো উদিত হয়নি।
আল্লাহ নতুন নতুন নিয়ামাত সৃষ্টি করে জান্নাতীদেরকে উপহার দিতে থাকবেন।
আল্লাহ জান্নাতীদেরকে তাঁর দর্শন দান করে ধন্য করবেন।
আল্লাহর দর্শনই হবে জান্নাতীদের নিকট সবচে' বেশি আনন্দের বিষয়।

আল্লাহ মহাশিল্পী।
আল্লাহ মহাবিজ্ঞানী।

আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য তুলনাহীন।

আল্লাহর কোন খুঁত নেই।
আল্লাহর কোন ত্রুটি নেই।
আল্লাহর কোন অপূর্ণত্ব নেই।

পৃথিবীর সবগুলো গাছ দিয়ে যদি কলম বানানো হয়, সমুদ্রগুলোর পানির সাথে আরো সাত সমুদ্রের পানি মিলিয়ে যদি কালি বানানো হয়, তবুও আল্লাহর কথা লিখে শেষ করা যাবে না।

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।
আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।
আল্লাহর জন্যই সব সম্মান।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সমাজ-বিপ্লব

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাব কালের সমাজ-চিত্র

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। কিন্তু মানুষ নবী-রাসূলদের শিক্ষার ওপর দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাব কালের পৌনে ছয় শত বছর আগে ফিলিস্তিনে ইসলাম প্রচার করেছিলেন ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ)। পৃথিবীর দিকে দিকে তাঁর বার্তা পৌছে গিয়েছিলো। কিছুসংখ্যক লোক তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে আসমানে তুলে নেয়ার অল্পকাল পরই লোকেরা তাঁর শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়ে। পৃথিবীর সর্বত্র বহু-ঈশ্বরবাদ আবারো মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ধর্মের নামে অধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ ধর্মীয় বিকৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একত্ববাদের প্রতীক মাক্কার কাবা গৃহে তিনশত ষাটটি কল্পিত দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপিত হয়। এইগুলোর পূজা-অর্চনা করা হতো। এইগুলোর উদ্দেশ্যে পশু বলিদান করা হতো। ইরানীরা আগুনের অনির্বাণ শিখার পূজা করতো। ভারতীয়রা পূজা করতো অসংখ্য দেব-দেবীর। পৃথিবীর সর্বত্রই পৌত্তলিকতা জেঁকে বসেছিলো। ঘরে ঘরে ও উপাসনালয়ে ছিলো পাথরের কিংবা কাঠের তৈরি মূর্তির ছড়াছড়ি।

২. পৃথিবীর বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে বহু রাজা ও সম্রাট জেঁকে বসেছিলেন। তাঁরা মানুষের প্রভু হয়ে বসেছিলেন। তাঁদের খেয়াল খুশীই ছিলো আইন। আইনের শাসন বলতে যা বুঝায় তা কোথাও প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। কোন কোন শাসক কিছুটা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ শাসকই ছিলেন উদ্ধত, অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী।

৩. রাজা ও সম্রাটদের জীবনযাত্রা ছিলো বিলাসে পরিপূর্ণ। তাঁদের বিলাসী জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন ছিলো প্রচুর অর্থের। আর এই অর্থের যোগান দিতে হতো জনসাধারণকে। তাদের ওপর ট্যাক্সের ওপর ট্যাক্স চাপানো হতো। ট্যাক্স আদায় না করতে পারলে তাদেরকে নিপীড়নের শিকার হতে হতো।

৪. রাষ্ট্রীয় তহবিল ছিলো রাজা বা সম্রাটের তহবিল। এতে জনগণের অধিকার স্বীকৃত ছিলো না। কোন রাজা বা সম্রাট জনগণের জন্য অর্থ ব্যয় করলে তা তার

বিশেষ অনুগ্রহ বলে গণ্য হতো। রাজা বা সম্রাট জনগণের কল্যাণে অর্থ ব্যয় না করলে কারো কিছু বলার ছিলো না।

৫. দেশে দেশে সামাজিক ভেদাভেদ প্রকট আকার ধারণ করেছিলো। রাজা বা সম্রাটকে ঘিরে একটি অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠে। তাদের ও জনগণের মাঝে গড়ে উঠেছিলো দুস্তর ব্যবধান। অভিজাত শ্রেণী সাধারণ মানুষকে ঘৃণার চোখে দেখতো।

৬. সাধারণ মানুষ ছিলো কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, ক্ষুদে ব্যবসায়ী কিংবা কুটির শিল্পী। এক শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষ ছিলো ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী। পৃথিবীর সকল দেশেই দাস ও দাসী বেচাকেনার জন্য হাট বসতো। এক মনিব থেকে আরেক মনিব তাদেরকে কিনে নিতো। মনিবের বাড়িতে, খামারে কিংবা কারখানায় দিনভর-রাতভর শ্রম দেয়াই ছিলো তাদের কর্তব্য।

৭. শাসক শ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণী ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত থাকতো। সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ, দামী গৃহসামগ্রী সংগ্রহকরণ, বিভিন্ন সৌন্দর্য উপকরণ সংগ্রহকরণ, দামী পোশাক পরিধান ও রকমারি খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন তাদের জীবনব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

৮. শাসক শ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণী মদপান করতো, অর্ধ-উলংগ নারীদের নাচ দেখতো, অশ্লীল গান ও বাদ্য শুনতো এবং অগণিত নারীর সাথে লাম্পট্য করতো।

৯. নারীদের কোন মর্যাদা ছিলো না। শাসক শ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণী তাদের যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য তাদের প্রাসাদে অসংখ্য নারীকে রক্ষিতা হিসাবে রাখতো। তারা বহু নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতো। কোন কোন দেশে বিমাতাকে বিয়ে করার রীতি চালু ছিলো। কন্যা সন্তানকে হেয় জ্ঞান করা হতো। আরবের বহু নিষ্ঠুর পিতা তাদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো।

১০. সাধারণ মানুষের জান, মাল ও ইযযাতের নিরাপত্তা ছিলো না। তারা ছিলো চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের শিকার। মানুষের জীবনে কোন স্বস্তি ও শান্তি ছিলো না।

১১. সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিলো প্রকট। ট্যাক্সের বোঝা বহন করে করে মানুষের মেরুদণ্ড ভেংগে গিয়েছিলো। সুদ, জুয়া, মওজুদদারী ইত্যাদি এই অর্থনৈতিক বৈষম্য অসহনীয় করে তুলেছিলো।

১২. শাসকগণ আপন রাজ্য সম্প্রসারণে ছিলেন আগ্রহী। নানা অজুহাতে তাঁরা পররাজ্য আক্রমণ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতেন। বিজিত রাজ্যে ঢুকে লুণ্ঠন চালাতেন। তাঁদের সৈন্যগণ বিজিত জনপদগুলোর নারীদেরকে পাইকারীভাবে ধর্ষণ করতো।

১৩. বেকায়দায় পড়ে কোন রাজা বা সম্রাট ভিন্ন রাজ্যের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করতেন। কিন্তু সমস্যা কাটিয়ে উঠলেই চুক্তি ভংগ করে আবার যুদ্ধে মেতে উঠতেন।

ইসলামী বিপ্লবোত্তর মাদীনার সমাজ-চিত্র

১. এই অমানিশার ঘনঘোর অন্ধকারে আদর্শিক সূর্যোদয় হলো খৃস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে আরব উপদ্বীপে সংঘটিত হলো এক মহাবিপ্লব। গড়ে উঠলো এক নতুন সমাজ ও সভ্যতা।

সেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান গৃহীত হলো আইনের সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে। আইনের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে স্বীকৃতি পেলো আল্লাহর রাসূলের (সা) সুন্নাহ। আর এই দুটোই ছিলো নির্ভুল, ভারসাম্যপূর্ণ, সার্বজনীন, চির নতুন ও কল্যাণকর উৎস। পৌত্তলিকতার অবসান ঘটলো। প্রতিষ্ঠিত হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওয়াহদানীয়াত। মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলো মানুষ। স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করে মানবতা উল্লসিত হয়ে উঠলো।

২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মাদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন দশ বছর। তিনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। শাসক ও শাসিত সকলেই ছিলো আইনের চোখে সমান। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিজাত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হতো না। তাঁর ইন্তিকালের পর আমীরুল মুমিনীন হিসেবে আবু বাক্‌র আসসিদ্দিক (রা), উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), উসমান ইবনু আফফান (রা) ও আলী ইবনু আবী তালিব (রা) একই ধারা অনুসরণ করেন।

৩. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশিদীন ইচ্ছে করলে অঢেল অর্থের মালিক হতে পারতেন। কিন্তু দুনিয়ার সর্বোচ্চ বিলাসিতাও আখিরাতের নিয়ামাতের তুলনায় অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য– সেই সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন সজাগ। ফলে তাঁরা কোন প্রাসাদ তৈরি করেননি। দামি আসবাব দিয়ে ঘর ভর্তি করেননি।

রকমারি সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণের দিকে মনোযোগ দেননি। তাঁরা অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। ফলে তাঁদের প্রয়োজনে জনগণের ওপর তাঁরা কোন ট্যাক্স ধার্য করেননি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত ইনফাক ছাড়া জনগণকে আর কোন ট্যাক্সের বোঝা বহন করতে হতো না।

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় তহবিলকে বলা হতো বাইতুলমাল। এটি ছিলো জনগণের তহবিল। জনগণের দারিদ্র্য মোচন ও বহুমুখী কল্যাণ সাধনের জন্য বাইতুলমালের অর্থ-সম্পদ খরচ করা হতো। জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইতুলমালের অর্থ-সম্পদ খরচ করা হতো।

৫. মাদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে অভিজাত ও অ-অভিজাত বলে কোন শ্রেণীভেদ ছিলো না। বংশ, পদ, বর্ণ বা অর্থবল দ্বারা কারো মর্যাদা নির্ণীত হতো না। সবচে' বেশি মর্যাদাবান বা সম্মানার্হ ব্যক্তি বলে স্বীকৃতি পেতেন আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণ।

৬. সকল পেশার মানুষকেই মর্যাদা দেয়া হয়। সকলের জন্যই উন্নত পেশায় প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। দাস-দাসীদের মুক্তির জন্য বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। মুক্ত দাসেরা অন্যদের মতোই রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক উচ্চ পদসমূহে নিয়োগ লাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়।

৭. মদ উৎপাদন, বিপণন ও মদ পান নিষিদ্ধ হয়। পর্দার বিধান কার্যকর করা হয়। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ হয়। নাচ-গান-বাদ্য বন্ধ হয়। যাবতীয় অশ্লীল কাজের মূলোৎপাটন করা হয়। অবৈধ যৌন আচরণের জন্য কঠোর শাস্তি র ব্যবস্থা করা হয়। ফলে সমাজ অংগনে পবিত্রতার প্রবাহ সৃষ্টি হয়।

৮. বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক কঠোরভাবে দমন করা হয়। বহু বিবাহ বন্ধ করে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ চারটি পর্যন্ত বৈধ রাখা হয়। বিমাতা বিবাহ বন্ধ করা হয়। পিতা ও স্বামীর অর্থ-সম্পদে নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়।

৯. সকল মানুষের জান, মাল ও ইযযাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই নির্মূল করা হয়। সকল মানুষ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মুক্ত হয়। মানুষ স্বস্তি ও শান্তি লাভ করে পুলকিত হয়।

১০. মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী সুদ, জুয়া, মওজুদদারী ও একচেটিয়া ব্যবসা উচ্ছেদ করা হয়। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় যারা হেরে গিয়েছিলো তাদেরকে শক্তি যোগানের জন্য যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

১১. ঠুনকো অজুহাতে পররাজ্য আক্রমণের নীতি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করা হয়। আল্লাহর দীনের প্রয়োজন ব্যতিরেকে আর যেই কোন কারণে যুদ্ধে জড়ানো নিষিদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হয়। পলায়নরত শত্রুসেনার ওপর আঘাত হানা নিষিদ্ধ হয়। বিজিত রাজ্যের ঘরে ঘরে লুণ্ঠন-নীতি পরিত্যাজ্য হয়। বিজিত রাজ্যের নারীদেরকে ধর্ষণ করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে নির্ধারিত হয়।

১২. শত্রুপক্ষ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী হলে বেকায়দায় ফেলে তার ওপর চড়াও হওয়ার নীতি পরিত্যাগ করা হয়। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে নিষ্ঠা সহকারে তা অনুসরণ করা হয়। ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতাকে আন্তর্জাতিক নীতির ভিত্তি বানানো হয়।

খৃস্টীয় ৬২২ সনে মাদীনাকে কেন্দ্র করে আরব উপদ্বীপে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী মাত্র দশটি বছরে সুখ, শান্তি, কল্যাণ, ন্যায় ও পবিত্রতার এই অতুলনীয় সমাজ গড়ে উঠে। আরো পরবর্তী সিকি শতাব্দীর মধ্যে ইসলামের আলো পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এই বিপ্লবের হাতিয়ার ছিলো আল কুরআন

আল কুরআন মানুষের সামনে নির্ভুল জীবন-দর্শন পেশ করে। এটি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রকৃত পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরে। বিশ্বজাহানের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচিত করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। পৃথিবীর জীবনে মানুষের কর্তব্য বিশদভাবে বিবৃত করে। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্য পালনে অবহেলা প্রদর্শন করলে যেই ভয়াবহ শাস্তি পেতে হবে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশানুবর্তী জীবন যাপন করলে দুনিয়ার জীবনে যেই সুখ, শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত হবে এবং আখিরাতে পুরস্কার হিসেবে যেইসব নিয়ামত প্রদান করা হবে তার বিবরণ পেশ করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদকে (সা) নবী বানানোর পর ধারাবাহিকভাবে অংশ অংশ করে আল কুরআন নাযিল করতে থাকেন। নবী মুহাম্মাদ (সা) মানুষের কাছে গিয়ে আল কুরআন পড়ে শুনাতে থাকেন ও আল কুরআনের ওপর ঈমান এনে এর দাবি অনুযায়ী জীবন গঠনের তাকিদ দিতে থাকেন। যাঁরা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ওপর ঈমান এনেছিলেন তাঁরা তাঁদের জীবনের সাথে আল কুরআনকে সম্পৃক্ত করে নেন।

জীবনের সাথে আল কুরআনের এই সম্পৃক্তি তাঁদের চিন্তার বিশুদ্ধি সাধন করে। আর চিন্তার এই বিশুদ্ধিই তাঁদের কর্মধারাকে বিশুদ্ধ করে তোলে। এইভাবে একদল মানুষের জীবনে ঘটে গেলো মহা বিপ্লব। নব চেতনায় উদ্দীপিত এই মানুষগুলোই প্রতিষ্ঠিত জাহিলী সমাজ ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করতে থাকেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা পাগলপারা হয়ে উঠেন। মানুষ মানুষের দাস নয়, সকল মানুষ আদমের সন্তান, কাজেই সকল মানুষ ভাই ভাই– তাঁরা এই বিপ্লবী আওয়াজ তুললেন। মানুষের মনগড়া সকল মতবাদ বর্জন করে তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান আল ইসলামকে বেছে নেওয়ার জন্য তাঁদের চেনা-অচেনা সকল মানুষকে আহ্বান জানাতে থাকলেন।

এই বিপ্লবী মানুষগুলোর উন্নত চিন্তা, পবিত্র চরিত্র, পরিশীলিত আচরণ, নিরলস প্রয়াস, নিঃস্বার্থতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, নির্ভীকতা ও জ্ঞানের স্বচ্ছতা প্রত্যক্ষ করে এগিয়ে আসে আরো অনেক মানুষ। এক পর্যায়ে ইয়াসরিবে আল ইসলামের পক্ষে গণভিত্তি রচিত হয়। সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিকশিত হয় ইসলামী রাষ্ট্র সংগঠন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) হন এই নতুন রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান। তেরো বছর যাঁরা বিপ্লবী মানুষ রূপে গড়ে উঠেছিলেন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিপ্লবের তাঁরাই হলেন ধারক-বাহক।

উপসংহার

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) ইসলামী রাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টার ইতিহাস গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এই কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সমাজ বিপ্লবের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন আল কুরআনের সাথে একদল মানুষের সম্পৃক্তি। অর্থাৎ আল কুরআনের ভিত্তিতে সমাজ বিপ্লব ঘটাতে হলে প্রথমেই গড়ে তুলতে হবে আল কুরআনের আলোকে আলোকিত একটি বলিষ্ঠ জেনারেশন। এঁরা যখন গণ-মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবেন তখনই হবে সমাজ বিপ্লব। ইসলামী বিপ্লবের এটিই সঠিক ও স্বাভাবিক পদ্ধতি।

ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক পদ্ধতি

বিপ্লব

বিপ্লব মানে হচ্ছে সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।

ইসলামী বিপ্লব

সমাজ-ব্যবস্থার সকল স্তর, দিক ও বিভাগে ইসলামের বিধি-বিধান কার্যকর হওয়ার নাম ইসলামী বিপ্লব।

'ইকামাতুদ্ দীন', 'ইযহারু দীনিল হাক', 'খিলাফাত প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি পরিভাষা 'ইসলামী বিপ্লব' পরিভাষার সমার্থক।

ইসলামী বিপ্লবের দুইটি শর্ত

ইসলামী বিপ্লবের জন্য দুইটি শর্ত পূরণ হওয়া অত্যাবশ্যক। শর্ত দুইটি হচ্ছে :

ক. একদল যোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্বের উদ্ভব।

খ. ইসলামী গণ-ভিত্তি সৃষ্টি।

ইসলামী চিন্তা-চেতনা, ইসলামী মন-মানসিকতা ও ইসলামী চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিকেই বলা হয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব।

একজন ইসলামী নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি মৌলিক মানবীয় গুণেও সমৃদ্ধ হন তিনি হন যোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব। ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য এই ধরনের বহু সংখ্যক ব্যক্তির বিদ্যমানতা অত্যাবশ্যক।

কোন ভূ-খণ্ডের জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশের ইসলামী চিন্তা-চেতনা, ইসলামী মন-মানসিকতা ও ইসলামী চরিত্রসম্পন্ন রূপে গড়ে ওঠার নাম ইসলামী গণ-ভিত্তি।

এই গণ-ভিত্তি গড়ে না ওঠা পর্যন্ত কোন ভূ-খণ্ডে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক নয়। আলকুরআনের সূরাহ আর রা'দের ১১ নাম্বার আয়াত সেই কথারই ইংগিত দেয়।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন কাউমের অবস্থার পরিবর্তন ঘটান না যেই পর্যন্ত না তারা তাদের চিন্তা ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়।"

নবী-রাসূলদের ব্যক্তি গঠন ও গণ-ভিত্তি সৃষ্টির প্রয়াস

নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) ইসলামী ব্যক্তি গঠন ও ইসলামী গণ-ভিত্তি সৃষ্টির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা যেমন ইসলামের মর্মকথা পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন, তেমনিভাবে চেষ্টা করেছেন সমাজের চালিকা শক্তি অর্থাৎ নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিদের কাছে তা পৌঁছাবার জন্য।

সমাজের চালিকা শক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে অপরাপর মানুষের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা সহজ হয়ে যায়। সেই জন্যই নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) সমাজের চালিকা শক্তিকে বিশেষভাবে টার্গেট বানিয়ে ছিলেন।

ইবরাহীম (আ) উর সাম্রাজ্যের সম্রাট নামরূদের কাছে এই উদ্দেশ্যেই ইসলামের মর্মকথা পৌঁছিয়েছিলেন।

একই উদ্দেশ্যে মূসা ইবনু ইমরান (আ) মিসরের ফিরআউন মারনেপতাহ-র কাছে ইসলামের মর্মকথা তুলে ধরেছিলেন।

ঠিক এই উদ্দেশ্যেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আলআরাবীয়ার শীর্ষ স্থানীয় নেতা আবু জাহল, উতবাহ ইবনু রাবীয়াহ, শাইবাহ ইবনু রাবীয়াহ, আলওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাহ প্রমুখের কাছে ইসলামের মর্মকথা উপস্থাপন করেছিলেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যক্তি গঠন পদ্ধতি

ইসলামী ব্যক্তি গঠনের জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কোন অস্বাভাবিক পদ্ধতি অবলম্বন করেননি।

তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি ছিলো সহজ ও স্বাভাবিক। তদুপরি তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি ছিলো আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত।

আলকুরআনের জ্ঞান বিতরণ এবং আলকুরআনের জ্ঞানের ভিত্তিতে চরিত্র গঠনের জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণই ছিলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যক্তি গঠন পদ্ধতি।

আলকুরআনের সূরাহ আলজুমুআহর ২ নাম্বার আয়াত, সূরাহ আলবাকারার ১৫১ নাম্বার আয়াত ও সূরাহ আলে ইমরানের ১৬৪ নাম্বার আয়াতে "ইয়াতলূ

'আলাইহিম আয়াতিহী ওয়া ইউযাক্কিহিম" (যাতে সে লোকদেরকে আয়াত পড়ে শুনায় ও তাদের তাযকিয়াহ করে) বলে সেই পদ্ধতির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাঁরা মুমিন হতেন তাঁরাও সংগে সংগেই ইসলামের মুবাল্লিগ বা দা'য়ী ইলাল্লাহ হয়ে যেতেন।

তাঁরাও আলকুরআনের জ্ঞান বিতরণ এবং আলকুরআনের জ্ঞানের ভিত্তিতে চরিত্র গঠনের জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করতেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বিপ্লব সাধনের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করেননি

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাবকালে আলআরাবীয়ার প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র বহন করতো। অর্থাৎ তখন অস্ত্র রাখা ও অস্ত্র বহন করা বৈধ ছিলো।

আবূ জাহল ও তার অনুসারীদের হাতে যেমন তলোয়ার, বল্লম ও তীর ছিলো, তেমনিভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীদের হাতে তলোয়ার, বল্লম ও তীর ছিলো।

উভয় পক্ষের অস্ত্রের মান ছিলো সমান।

ইসলামী ব্যক্তি গঠন ও গণ-ভিত্তি রচনার প্রয়াস চালাতে গিয়ে মাক্কায় অবস্থান কালের তেরোটি বছর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন।

মুশরিকদের হামলায় হারিছ ইবনু আবী হালাহ (রা), সুমাইয়া (রা), ইয়াসির (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসির (রা) শাহাদাত বরণ করেন।

অনেকেই হন আহত।

কিন্তু বৈধ অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীরা এই যুলমের প্রতিকারের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করেননি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিলো "কুফ্‌ফু আইদিয়াকুম" (তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখ) অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবহার করো না।

এই নির্দেশ এসেছিলো ওহী গায়র মাতলূ-র মাধ্যমে। পরবর্তী কালে সূরাহ আন্ নিসার ৭৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই বিষয়টি উল্লেখ করেন।

ইসলাম-বৈরী শক্তি হামলার পর হামলা চালাতে থাকে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন সূরাহ নাযিল করে মুমিনদেরকে বার বার ছবর অবলম্বন করার তাকিদ দিতে থাকেন।

উল্লেখ্য যে, ছবরের বহুবিধ অর্থের কয়েকটি হচ্ছে–

নিজের আবেগ সংযত রাখা,

রাগের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ না করা,

বিপদ-আপদে ঘাবড়ে না যাওয়া,

ত্বরা-প্রবণতা পরিহার করা,

কাংখিত ফল পেতে দেরি দেখে অস্থির না হওয়া,

অশোভন আচরণে উত্তেজিত না হওয়া,

প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজের কর্তব্যে অবিচল থাকা।

আরো উল্লেখ্য যে, কোন নবীই ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য সশস্ত্র তৎপরতা চালাননি। আর নবীরা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছারই প্রতিনিধিত্ব করতেন।

একদল মুমিন অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি চেয়েও অনুমতি পাননি

প্রতি বছর আলআরাবীয়ার উকায নামক স্থানে যুল কা'দাহ মাসের ১ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত মেলা অনুষ্ঠিত হতো। দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাজার হাজার মানুষ বিশ দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে ভালো-মন্দ বহু প্রকারের কর্মকাণ্ড করতো। অতঃপর তারা যুল কা'দাহ মাসের ২১ তারিখ যুলমাজান্না নামক স্থানে এসে অবস্থান গ্রহণ করতো। এখানে তারা থাকতো দশ দিন।

এর পর তারা যুলমাজায নামক স্থানে এসে তাঁবু গাড়তো। তারা এখানে অবস্থান করতো যুলহিজ্জা মাসের ১ তারিখ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত।

অতঃপর তারা যুলহিজ্জা মাসের ৮ তারিখে মিনাতে অবস্থান গ্রহণ করতো।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাবার জন্য এই মেলাগুলোতে যেতেন এবং সময় সুযোগ বুঝে তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে লোকদের সাথে আলাপ করতেন, তাদেরকে আলকুরআনের আয়াত পড়ে শুনাতেন এবং আলকুআনের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানাতেন।

নবুওয়াতের দশম সনে মিনারই একটি পার্বত্য খণ্ড আকাবাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ছয় জন ইয়াসরিববাসীর (মাদীনাবাসীর) সাথে আলাপ করেন। তাঁরা ইসলামের দাওয়াত কবুল করেন।

নবুওয়াতের একাদশ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ আকাবাতেই ইয়াসরিব থেকে আগত বারো জন ব্যক্তির সাথে আলাপ করেন। তাঁরা মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সর্বাবস্থায় ইসলামের ওপর অবিচল থাকার অংগীকার করেন। এই ঘটনাকেই বলা হয় প্রথম বাইআতে আকাবা।

নবুওয়াতের দ্বাদশ সনে ৭৫ জন ইয়াসরিববাসী আকাবাতে গভীর রাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন।

তাঁরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার শপথ নেন। এই ঘটনাটিকে বলা হয় দ্বিতীয় বাইআতে আকাবা।

এই সময় ইয়াসরিববাসীরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীদের ওপর পরিচালিত নির্যাতনের কথা জানতে পেরে তাঁকে ইয়াসরিবে (মাদীনায়) হিজরাত করার আহ্বান জানান।

আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে ইয়াসরিববাসীদের পক্ষ থেকে মিনাতে সমবেত যালিম মুশরিকদের ওপর হামলা চালাবার অনুমতি চাওয়া হয়।

ইয়াসরিববাসীদের অন্যতম লড়াকু ব্যক্তি আলআব্বাস ইবনু উবাদাহ ইবনু নাদলা (রা) বলেন,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ, যেই আল্লাহ আপনাকে সত্য জীবন-বিধানসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আপনি চাইলে আমরা আগামীকালই মিনায় অবস্থানকারীদের ওপর হামলা চালাবো।" মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "আমাকে এইরূপ কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তোমরা নিজ নিজ কাফিলায় ফিরে যাও।"

দ্রষ্টব্য : সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা-১২০

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি লাভ

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হিজরাতের অনুমতি লাভ করেন।

ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নীরবে মাক্কা ত্যাগ করে তাঁর সাথীরা ইয়াসরিব

হিজরাত করেন। শেষের দিকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বাকর আস্ সিদ্দিককে (রা) সাথে নিয়ে হিজরাত করেন।

মহানবী (সা) ইয়াসরিব আসার পর এর নাম হয় মাদীনাতুর্ রাসূল। মাদীনা একটি রাষ্ট্রের রূপ লাভ করে। আর নব-গঠিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। মাদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নাযিল হয় সূরাহ্ আলহাজের ২৫ থেকে ৭৮ নাম্বার আয়াত।

আর এই অংশটির একাংশে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীদেরকে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন।

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ. نِ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ اَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ط ...

আলহাজ ॥ ৩৯, ৪০

"লড়াইয়ের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের প্রতি যুলম করা হয়েছে, আর আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন, যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু এই জন্য যে, তারা বলেছিলো : আল্লাহ্ আমাদের রব।"

অস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ

সূরাহ্ আলহাজের ৩৯ ও ৪০ নাম্বার আয়াতে অস্ত্র ব্যবহারের 'অনুমতি' দেয়া হয়েছে। আর সূরাহ্ আলবাকারাহর ১৯০ নাম্বার আয়াতে দেয়া হয়েছে অস্ত্র ব্যবহারের 'নির্দেশ'।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

আলবাকারাহ ॥ ১৯০

"আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন না।"

"অনুমতি' ও 'নির্দেশ' দেয়ার মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। আমাদের

অনুসন্ধান অনুযায়ী 'অনুমতি' দেয়া হয় হিজরী প্রথম সনের যুলহিজ্জা মাসে এবং 'নির্দেশ' নাযিল হয় হিজরী দ্বিতীয় সনের রজব কিংবা শা'বান মাসে।"

দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সূরাহ আলহাজের তাফসীরের ৭৮ নাম্বার টীকা।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগের ও পরের কর্ম-পদ্ধতি

ক. ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) বলেন,

"ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মহানবীর (সা) প্রতি কেবল ইসলামী দাওয়াত পৌঁছানোর আদেশ ছিলো, জিহাদের (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হয়নি। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে তিনি যখন মাদীনায় হিজরাত করলেন এবং সেখানে ইসলামের দুশমনেরা তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলো তখন আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা) ও সাহাবীদেরকে জিহাদের (যুদ্ধের) অনুমতি দান করেন।"

দ্রষ্টব্য : আস্ সিয়াসাতুশ্ শারইয়াহ, ইমাম ইবনু তাইমিয়া, পৃষ্ঠা-২০৩

খ. হাফিয ইবনুল কাইয়েম (রহ) বলেন,

"এইভাবে প্রায় তের বছরকাল পর্যন্ত তিনি তাবলীগের মাধ্যমে মানুষের মনে আল্লাহ-ভীতি সৃষ্টির প্রয়াস পান। এই সময় তিনি কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি এবং কাউকে জিয্ইয়া দিতেও বলেননি। বরং ঐ সময় হাত গুটিয়ে রাখা, ধৈর্য ধারণ করা এবং সহনশীলতার পথ অবলম্বন করার জন্যই তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়। তারপর তিনি হিজরাতের নির্দেশ লাভ করেন। হিজরাতের পর সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দেয়া হয়। তারপর যারা রাসূলের (সা) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ (যুদ্ধ) করার এবং যারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে তাদের ওপর হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে আল্লাহর দীন পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়।"

দ্রষ্টব্য : যাদুল মা'আদ, হাফিয ইবনুল কাইয়েম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭১

গ. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) বলেন,

"এর আগে মুসলিমরা যদ্দিন দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন ছিলো তাদেরকে কেবল ইসলাম প্রচারের হুকুম দেয়া হয়েছিলো এবং বিপক্ষের যুলম-নির্যাতনে ছবর অবলম্বন করার তাকিদ করা হচ্ছিলো। এখন মাদীনায় তাদের একটি ছোট্ট

স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই প্রথমবার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে : যারাই এই সংস্কারমূলক দাওয়াতের পথে সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করে অস্ত্র দিয়েই তাদের অস্ত্রের জবাব দাও।"

দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সূরাহ আলবাকারার তাফসীরের ২০০ নাম্বার টীকা।

আরো উল্লেখ্য যে, আলমাদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একবছর পর মাক্কার মুশরিকগণ এই নব গঠিত রাষ্ট্রের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। তিনগুন বেশি শক্তিশালী মুশরিক বাহিনীর ওপর মুসলিমগণ বিজয় লাভ করেন বদর প্রান্তরে আল্লাহর মহা অনুগ্রহে।

আল্লাহ ভালো করেই জানতেন যে অ-মুসলিম শক্তি এই পরাজয় মেনে নিয়ে শত্রুতা বন্ধ করে দেবে না। বরং আরো বেশি সামরিক শক্তি যোগাড় করে আবারও আক্রমণ চালাবার জন্য এগিয়ে আসবে। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নাযিল করেন সূরাহ আলআনফাল।এই সূরাহর একাংশে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র আলমাদীনার কর্ণধারদেরকে প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি অর্জনের নির্দেশ প্রদান করেন।

আল্লাহ বলেন,

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ. আল আনফাল ॥ ৬০

"তাদের মুকাবিলার জন্য তোমরা যতো বেশি সম্ভব শক্তি সঞ্চয় কর।"

ইসলামী আন্দোলনের স্বাভাবিক বর্ধন

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর নবী-রাসূলগণ অত্যন্ত স্বাভাবিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। প্রধানত মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা তাঁদের প্রয়াস চালিয়েছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহও (সা) নিরলসভাবে চালিয়ে গেছেন 'আদ্ দাওয়াতু ইলাল্লাহ'র কাজ। আর তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন মাক্কার সত্য-সন্ধানী ও সাহসী একদল যুবক-যুবতী। তিনি এঁদেরকে সংঘবদ্ধ করে ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্ব– ইসলামী ব্যক্তিত্ব–রূপে গড়ে তোলেন।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রায় অধিকাংশ ইসলাম-বিরোধী হওয়ায় মাক্কাবাসীরা গণ-

হারে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে পারেনি। ফলে মাক্কায় গড়ে ওঠেনি ইসলামী গণ-ভিত্তি।

পক্ষান্তরে ইয়াসরিবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অধিকাংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়ান। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইসলাম গ্রহণ করায় সাধারণ মানুষের ইসলাম গ্রহণ করা সহজ হয়ে যায়। ফলে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে আসে ইয়াসরিবের বিপুল সংখ্যক মানুষ। গড়ে ওঠে ইসলামী ভাবধারা পুষ্ট গণ-ভিত্তি, ইসলামী সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণের বুনিয়াদ।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ও সরকার গঠনের সংগ্রাম একটির পর একটি স্তর অতিক্রম করে সামনে এগিয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলকুরআনের সূরাহ আলফাত্হে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পরিচালিত সংগ্রামের স্বাভাবিক বর্ধনের একটি চমৎকার উপমা পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ. আল ফাতহ ॥ ২৯

"এ এমন এক কৃষি যা অংকুর বের করলো, অতপর শক্তি সঞ্চয় করলো, অতপর মোটা-তাজা হলো এবং অবশেষে নিজ কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে গেলো।"

এই আয়াতাংশে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) পরিচালিত আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা :

১. অংকুর বের করা,

২. শক্তি সঞ্চয় করা,

৩. মোটা-তাজা হওয়া,

৪. কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

'অংকুর বের করা'র অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনাকরণ।

'শক্তি সঞ্চয় করা'র অর্থ হচ্ছে আহ্বানে সাড়া দানকারী ব্যক্তিদেরকে সংঘবদ্ধ ও সংশোধিত করে সাংগঠনিক শক্তি অর্জন।

'মোটা-তাজা হওয়া'র অর্থ হচ্ছে কর্ম-এলাকার সর্বত্র প্রভাব সৃষ্টি ও গণ-মানুষের সমর্থন লাভ। আর গণ-মানুষের সমর্থন লাভেরই আরেক নাম গণ-ভিত্তি অর্জন।

'কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া'র অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন।

প্রকৃতপক্ষে, এটাই হচ্ছে ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক পদ্ধতি।

উপসংহার

মুমিনদের জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) হচ্ছেন 'উসওয়াতুন হাসানা' (সর্বোত্তম উদাহরণ)। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি 'উসওয়াতুন হাসানা'। ইসলামী বিপ্লব সাধন তথা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনিই 'উসওয়াতুন হাসানা'।

আরো উল্লেখ্য যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই 'উসওয়াতুন হাসানা'র অনুসরণকেই তাঁর ভালোবাসা পাওয়ার শর্ত বানিয়েছেন।

বর্তমান মুসলিম সমাজ ও তাবলীগে দীন

- বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা ইসলামের জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখে না।
- বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা ইসলাম ও জাহিলিয়াতের পার্থক্য বুঝে না।
- বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা আংশিক ইসলামকেই পূর্ণাংগ ইসলাম মনে করে।
- বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা শারীয়াহর খুঁটিনাটি বিষয়ের মতপার্থক্যকে বড়ো করে দেখে উম্মাহর সংহতি বিনষ্ট করে চলছে।
- বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা ইসলাম সম্পর্কে যতোটুকু জ্ঞান রাখে বাস্তব জীবনে ততোটুকুও অনুশীলন করে না।
- বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা মনে করে যে মাঝে মধ্যে কোন বুজর্গ ব্যক্তির নিকট গিয়ে দু'আ হাছিল করলেই আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে, নিজে কষ্ট করে ইসলামের অনুশীলন করার প্রয়োজন নেই।
- বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা কোন কোন জীবিত কিংবা মৃত ব্যক্তির প্রতি এমনভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যা পূজার পর্যায়ে পড়ে।
- বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা মনে করে যে যৌবনে হারাম হালালের তোয়াক্কা না করে দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করে বৃদ্ধাবস্থায় তাওবাহ করলেই আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে।
- বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা আপন স্বার্থ হাছিলের জন্য ইসলামের বিধি-বিধান বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না।
- বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা আখিরাতের ক্ষতির তুলনায় দুনিয়ার ক্ষতিকে বড়ো করে দেখে।
- বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, কৃষ্টি ও আইন-কানুনের ওপর ইউরো-এমেরিকার

রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, কৃষ্টি ও আইন-কানুনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

❖ বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা বহুবিধ কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

❖ বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা অমুসলিমদের পরিচালিত প্রচার যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয়ে তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

❖ বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা অমুসলিমদের পরিচালিত প্রচার যুদ্ধের ফলে মানসিকভাবে পরাজিত হয়ে ইসলামী জীবন বিধানকে কাটছাঁট করার ওকালতি করে।

❖ বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা ইসলামের বিধি-বিধানের এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যাতে প্রমাণিত হয় যে ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই।

❖ বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা ইসলামী অনুশাসনগুলোকে এই যুগে অচল মনে করে।

❖ বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা ইসলামের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে এবং ইসলামের প্রতি কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখে ও লেখালেখি করে।

❖ বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা পৃথিবীর অংগনে মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে না এবং তারা মানুষ ও অন্যান্য জানোয়ারের মধ্যে বড়ো রকমের পার্থক্য রয়েছে বলেও মনে করে না।

এই বিশ্লেষণ থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন বিপুল সংখ্যক লোক রয়েছে যারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম নয়। তদুপরি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এমন লোকও রয়েছে যারা জোরেসোরে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলছে।

আফসোসের বিষয়, মুসলিম সমাজের এই দুরবস্থার কারণে মুসলিমদের পাশে শতাব্দীর পর শতাব্দী বসবাসকারী হিন্দু-বৌদ্ধ ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী ইসলামের কল্যাণময়তা সম্পর্কে কোন ধারণাই পেলো না।

এই দুরবস্থা সৃষ্টির কারণ

মুসলিম সমাজের এই দুরবস্থা রাতারাতি সৃষ্টি হয়নি। এর পেছনে রয়েছে কয়েক শতাব্দীর কার্যকারণ। প্রধানত তিনটি বিষয়কে এই দুরবস্থা সৃষ্টির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যথা- (১) তাবলীগে দীনের প্রতি মুসলিম শাসকদের উদাসীনতা, (২) পূর্ণাংগ ইসলামকে তার সঠিক ঔজ্জ্বল্যসহ গণ-মানুষের সামনে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে দীনী নেতৃবৃন্দের অপ্রতুল ভূমিকা ও (৩) বিজয়ী জাতির চাপিয়ে দেয়া সেকুলার শিক্ষা।

১. তাবলীগে দীনের প্রতি মুসলিম শাসকদের উদাসীনতা

খিলাফাতে রাশিদা ইসলামের সোনালী যুগ। সেই যুগে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসককে বলা হতো আমীরুল মুমিনীন। আল কুরআন ও আস্‌সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করাই ছিলো তাঁর সর্বপ্রধান কর্তব্য। ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি থাকতেন সদা সচেষ্ট। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিফহাল করে তোলার জন্য তিনি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

খিলাফাতে রাশিদার পর রাজতন্ত্র কায়েম হয়। এই যুগে ইসলামের রাজনৈতিক বিধান পরিত্যক্ত হয়। এই মৌলিক বিচ্যুতির ফলে আরো অনেক ত্রুটি ঢুকে পড়ে মুসলিম উম্মাহর সামষ্টিক জীবনে। ফলে উন্নতির পরিবর্তে অবনতির দিকে দ্রুত ধাবিত হয় মুসলিম উম্মাহ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকে অবনতির এই ধারা। এমনি তরো এক পর্যায়ে শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে মুসলিমদের আগমন ঘটে বাংলাদেশে।

এই বিজেতাদের মাঝে সোনালী যুগের শাসকদের গুণপনা ছিলো না। তাঁরা রাজ্য বিস্তারের দিকেই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। জনগণের ওপর শাসন কর্তৃত্ব নিশ্চিত করাই ছিলো তাঁদের প্রধান কাজ। তাঁরা রাষ্ট্রে ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রবর্তন করেন। শারীয়াহ কোর্ট স্থাপন করেন। মাসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। মাসজিদ ও মাদ্রাসার জন্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু পূর্ণাংগ ইসলামের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন না। তাবলীগে দীনের প্রতি তাঁরা ছিলেন উদাসীন। তাঁদের এই উদাসীনতার কারণে সমাজ জীবনে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি কাঙ্ক্ষিত মানে বিকশিত হতে পারেনি।

ইসলামী মূল্যবোধ অগণিত মানুষের চিন্তা-চেতনার ভূমিতে শিকড় গাড়তে পারেনি।

২. পূর্ণাংগ ইসলামকে গণ-মানুষের সামনে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে দীনী নেতৃবৃন্দের অপ্রতুল ভূমিকা

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের অন্যতম সুফল এই ছিলো যে সেই সময় ইসলামী দুনিয়া থেকে ইসলামের বহু নিষ্ঠাবান মুবাল্লিগ এই দেশে আসেন। তাঁরা ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের সামনে তুলে ধরতে থাকেন। তাঁদের সাহচর্যে থেকে বহু লোক গড়ে ওঠে। তাবলীগে দীনের ক্ষেত্রে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের এই অবদান ছোট করে দেখার উপায় নেই। তবে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্য উপযোগী কর্মসূচী নিয়ে সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা তাঁদেরকে দেখি অনুপস্থিত। পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন বিধানকে তার সঠিক ঔজ্জ্বল্যসহ এই দেশের গণ-মানুষের সামনে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে তাঁদের কার্যক্রম ছিলো অপ্রতুল।

৩. বিজয়ী ইংরেজ জাতির চাপিয়ে দেয়া সেকুলার শিক্ষা

এই দেশে মুসলিম শাসনের স্থপতি ছিলেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খালজী। একের পর এক ছিয়াশি জন মুসলিম শাসক এই দেশ শাসন করেন। সর্বশেষ মুসলিম শাসক ছিলেন সিরাজুদ্দৌলাহ খান।

এই দেশে মুসলিম শাসনের শেষের দিকের ঘটনা-প্রবাহ খুবই বেদনাদায়ক। দেশ ও জাতির যাঁরা ছিলেন কর্ণধার তাঁরা চরম হিংসা-বিদ্বেষের শিকারে পরিণত হন। তাঁদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা এমন জঘন্য রূপ ধারণ করে যে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তাঁরা বিদেশীদের সাহায্য নিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। বিদেশীদের সাহায্য নিতে গিয়ে তাঁরা দেশের আযাদী বিপন্ন করে তুলছেন কিনা তা খতিয়ে দেখার মতো মানসিক সুস্থতাও তাঁদের ছিলো না।

সময় প্রবাহের এক অধ্যায়ে এসে নেতৃস্থানীয় একদল অপরিণামদর্শী মুসলিম ও একদল অর্থলিপ্সু অমুসলিম দি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনীর সাথে অশুভ আঁতাত গড়ে তুলে এই দেশে মুসলিম শাসন অবসানের নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হন।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ সনের ২৩শে জুন পলাশী প্রান্তরে সর্বশেষ মুসলিম শাসক সিরাজুদ্দৌলাহ খানের পরাজয়ের ফলে এই দেশে ইংরেজদের শাসন কায়েম হয়। অতঃপর এই দেশের মানুষকে ইংরেজদের গোলামী করতে হয় একশত নব্বই বছর।

ইংরেজ শাসকগণ ইসলামী দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন বাতিল করে তাঁদের আইন চালু করেন। শারীয়াহ কোর্ট ভেংগে দেন।

ইংরেজ শাসকগণ ফারসীর স্থলে ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা বানান। ফলে প্রশাসনিক চাকুরী পেতে হলে ইংরেজী ভাষা জানা জরুরী হয়ে পড়ে। ইংরেজ শাসকগণ মুসলিমদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেংগে দেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুদের মধ্য থেকে বহু সংখ্যক জমিদার গড়ে ওঠে। হিন্দুগণ বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংরেজদের প্রধান সহযোগীতে পরিণত হয়।

মুসলিমদের মাসজিদ ও মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য যেইসব সম্পত্তি ছিলো সেইগুলো বাজেয়াপ্ত করে মুসলিমদের শিক্ষা ও কৃষ্টির ভিত্ দুর্বল করে দেয়া হয়।

ইংরেজ শাসকগণ সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলাম বিতাড়িত হওয়ায় নব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়গুলো থেকে অগণিত যুবক বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠলেও ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবনধারা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। গায়ের রঙে এই দেশীয় হলেও চিন্তা-চেতনায় তারা ইংরেজদের অনুরূপ হয়ে গড়ে উঠতে থাকে।

সচেতন মুসলিম পরিবারগুলোই কেবল ইসলামী শিক্ষা ও কৃষ্টির সর্বশেষ দুর্গের ভূমিকা পালন করতে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অতি দ্রুততার সাথে সেকুলারিজমের যেই জোয়ার সৃষ্টি হয় তার প্রতিরোধে এই পারিবারিক শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী জনগোষ্ঠী

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন এমন এক জনগোষ্ঠী যারা (১) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে–

- আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়,
- তিনি চিরঞ্জীব, চির বিদ্যমান,
- একমাত্র তিনিই কারো মুখাপেক্ষী নন আর সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী,
- তাঁর সমতুল্য কেউ নেই,
- সকল প্রাণী, বস্তু ও শক্তি তাঁরই সৃষ্টি,
- তিনিই সুনির্দিষ্ট বিধান কার্যকর করে বিশ্বজাহান নিয়ন্ত্রণ করছেন,
- তিনি সর্বশক্তিমান,
- সকল কিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান,

- তিনি সকল কিছু দেখেন, শুনেন ও জানেন,
- তিনি পরম করুণাময়, আবার কঠোর শাস্তিদাতাও,
- তিনি সকল প্রশংসা, গৌরব ও সম্মানের হকদার,
- তিনি একমাত্র সার্বভৌম সত্তা,
- তিনিই একমাত্র উপাস্য,
- তিনিই একমাত্র বিধানদাতা,
- তিনি মানুষের নিরংকুশ আনুগত্যের হকদার,
- তিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা রূপে সৃষ্টি করেছেন,
- পৃথিবীর সকল নিয়ামাত তিনি মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন,
- তাঁর আদেশানুবর্তী জীবন যাপনের জন্যই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন,
- তাঁর দেয়া জীবন বিধান পূর্ণাংগ, নির্ভুল, কল্যাণময় ও চির নতুন,
- এটা তাঁর হক যে মানুষ শুধু তাঁরই দেয়া জীবন বিধান তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বাস্তবায়িত করবে,
- তিনি যাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযক দান করেন,
- তিনি যাকে ইচ্ছা অল্প পরিমাণে রিয্‌ক দান করেন,
- তাঁর অনুমোদন ছাড়া কারো ওপর কোন বিপদ আপতিত হতে পারে না,
- তিনি কারো কল্যাণ করতে চাইলে কেউ তা ঠেকাতে পারে না,
- তিনি প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুক্ষণ নির্ধারিত করে রেখেছেন,
- তিনি যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে জীবন বিধান পাঠিয়েছেন,
- তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা),
- তাঁর নাযিলকৃত সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন,
- আল্লাহ একদিন এই বিশ্বজাহান ভেংগে দেবেন,
- তিনি আবার নতুন কাঠামোতে আসমান ও পৃথিবী তৈরী করবেন,
- তিনি নতুন পৃথিবীকে সুবিশাল ও সমতল প্রান্তরে রূপ দেবেন,
- একটি নির্দিষ্ট দিনে তিনি এই বিশাল প্রান্তরে সকল মানুষকে জীবিত করে উঠাবেন,
- তিনি সকল মানুষকে তাঁর আদালতে হাজির করবেন,
- তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়ার জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের হিসাব নেবেন,
- তিনি সালেহ লোকদেরকে সুখ, শান্তি ও নিয়ামাতে পরিপূর্ণ জান্নাতে বসবাস করতে দেবেন।
- তিনি পাপী লোকদেরকে কঠিন শাস্তির স্থান জাহান্নামে পাঠাবেন,
- অতঃপর কোন মানুষের আর মৃত্যু হবে না।

এবং (২) যারা এই বিশ্বাসের তাকিদে–

- ❖ যাবতীয় মুনকার ও ফাহিশা কাজ থেকে বেঁচে থাকে,
- ❖ একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করে,
- ❖ সযত্নে সাউম পালন করে,
- ❖ যাকাত আদায় করে,
- ❖ হাজ করে,
- ❖ বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকে,
- ❖ সযত্নে আমানতের হিফাজাত করে,
- ❖ ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালন করে,
- ❖ সকলের সাথে সদাচরণ করে,
- ❖ খিদমাতে খালক্ করে,
- ❖ সর্বাবস্থায় ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে,
- ❖ ন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করে,
- ❖ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে,
- ❖ অপরাপর মানুষের কাছে ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানকে সুপরিচিত করে তোলার প্রচেষ্টা চালায়,
- ❖ লোকদেরকে মা'রূফ কাজের উৎসাহ দেয়,
- ❖ মুনকার কাজ করতে নিষেধ করে,
- ❖ সমাজের সকল স্তরে সৎ নেতৃত্ব কায়েমের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়,
- ❖ প্রতিপক্ষের মন্দ আচরণের মুকাবিলায় ভালো আচরণ করে,
- ❖ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাধাদানকারীদের পক্ষ থেকে পরিচালিত নিপীড়নের মুখে দৃঢ়পদ থাকে,
- ❖ হিংসা ও প্রতিহিংসা থেকে মনকে মুক্ত রাখে,
- ❖ দুনিয়ার লাভ-ক্ষতি নয় আখিরাতের লাভ-ক্ষতিকেই প্রাধান্য দেয়,
- ❖ সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে,
- ❖ হৃদয়ে আল্লাহর কথা স্মরণ রেখে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে ও
- ❖ আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করে জান্নাত লাভকে জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্যে পরিণত করে।

তাবলীগে দীন

এই দেশের মুসলিম সমাজে প্রত্যেক যুগেই এমনও বহুলোক ছিলেন যাঁরা ছিলেন পরহেযগার। তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতেন। কখনো কখনো অন্যদের সামনে দীনী বক্তব্য তুলে ধরতেন। কিন্তু একটি অনৈসলামী সমাজ কিংবা আধা ইসলামী সমাজকে পূর্ণাংগ ইসলামী সমাজে রূপান্তরিত করার জন্য যেই আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলা দরকার সেই ক্ষেত্রে তাঁদের পদচারণা আমরা দেখি না।

বর্তমান অধপতিত মুসলিম সমাজেও যথেষ্ট সংখ্যক সৎ লোক রয়েছেন। সন্দেহ নেই, তাঁদের সুসংগঠিত আন্দোলনের ওপরই নির্ভর করছে মুসলিম সমাজের সামগ্রিক সংশোধন।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের বিভিন্ন কনসেপ্ট গণ-মানুষের সামনে উপস্থাপন করে তাদেরকে পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করার নামই তাবলীগে দীন। এই কাজেরই আরেক নাম দাওয়াত ইলাল্লাহ।

তাবলীগে দীনের কার্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (১) ব্যক্তিগত কার্যক্রম (২) সামষ্টিক কার্যক্রম।

আসুন এই দুই ধরনের কার্যক্রম সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করি।

১. ব্যক্তিগত কার্যক্রম

- যেহেতু একই সময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সুকঠিন সেই জন্য একজন মুবাল্লিগের কর্তব্য হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে নেয়া।
- নির্বাচিত ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করা।
- সারাদিনের কোন্ অংশে তাঁরা কম ব্যস্ত থাকেন তা জেনে নেয়া।
- তাঁরা যেই সময় কম ব্যস্ত থাকেন সেই সময় তাঁদের সাথে দেখা করতে যাওয়া।
- তাদের কাছে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁদের বিরক্তির উদ্রেক না করা।
- তাঁদের সাথে নম্রভাবে আলাপ করা।
- তাঁরা কটূক্তি করলেও জবাবে কটূক্তি না করা।
- নিজের বক্তব্য গুছিয়ে ও হৃদয়গ্রাহীরূপে পেশ করা।

- ❖ সুন্দর সুন্দর যুক্তি দ্বারা নিজের বক্তব্যকে শক্তিশালী করে তোলা।
- ❖ তাঁদের প্রশ্নগুলোর সুন্দর জবাব দেয়া।
- ❖ যেইসব প্রশ্নের জবাব জানা নেই সেইগুলোর গোঁজামিল ধরনের জবাব না দিয়ে সময় চেয়ে নেয়া ও সঠিক জবাব জেনে নিয়ে পরবর্তী সাক্ষাতের সময় সেই জবাব পেশ করা।
- ❖ মাঝে-মধ্যে তাঁদেরকে নিজের ঘরে এনে আপ্যায়ন করে আন্তরিকতা সৃষ্টি করা।
- ❖ তাদের অসুস্থতার খবর পেলে তাঁদেরকে দেখতে যাওয়া।
- ❖ তাঁদেরকে মাঝে মধ্যে বই কিংবা পত্রিকা উপহার দেওয়া।
- ❖ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হ্যান্ডবিল তাঁদের হাতে পৌঁছানো।
- ❖ তাঁদের কাছে বই বিক্রির চেষ্টা করা।
- ❖ তাঁরা সম্মতি দিলে তাঁদেরকে ইসলামী পত্র-পত্রিকার গ্রাহক বানানো।
- ❖ তাঁদেরকে দারসুল কুরআন, আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা।
- ❖ অন্তত পনর দিনে একবার তাঁদের সাথে দেখা করা।
- ❖ কোথাও যাবার কালে সহযাত্রীদের সাথে দীনী বাক্যালাপ করার চেষ্টা করা।
- ❖ কর্মস্থলে কাজের ফাঁকে যখন সহকর্মীদের সাথে কথাবার্তা হয় তখন বেহুদা কথাবার্তা না বলে দুই চারটে দীনী কথা বলা।
- ❖ জুমআর দিন মাসজিদে, ঈদের মাঠে বা অন্য কোথাও সুযোগ হলেই দীনী আলোচনা পেশ করা।

২. সামষ্টিক কার্যক্রম

- ❖ কোন মাসজিদে বা কারো বৈঠকখানায় নিয়মিতভাবে দারসুল কুরআন অনুষ্ঠান।
- ❖ কোন মাসজিদে কিংবা কারো বৈঠকখানায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠান।
- ❖ কোন হলে বছরে কয়েকটি আলোচনা সভা কিংবা সেমিনার অনুষ্ঠান।
- ❖ কোন হলে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠান।
- ❖ সুবিধাজনক সময়গুলোতে তাবলীগে দীনের অভিযান।
- ❖ জনসভা অনুষ্ঠান।
- ❖ মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ এবং ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের ওপর জ্ঞানগর্ভ লেখা প্রকাশ।

- ক্যাসেটের মাধ্যমে দারসুল কুরআন, দারসুল হাদীস ও ইসলামী বক্তৃতা গণ-মানুষের নিকট পৌঁছানো।
- ইসলামী বই রচনা ও প্রকাশনা।
- ইসলামী পত্র-পত্রিকার গ্রাহক সৃষ্টির অভিযান।
- ইসলামী বই ও ক্যাসেট বিক্রির অভিযান।
- ইসলামী পাঠাগার স্থাপন।

এইসব কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য গণ-মানুষের সামনে বার বার উপস্থাপিত হতে থাকলে মানুষের চিন্তার ভ্রান্তি ক্রমশ দূর হতে থাকবে, ইসলাম সম্পর্কিত সংকীর্ণ ধারণার অবসান ঘটবে, ইসলামই যে মানুষের সত্যিকার উন্নতির গ্যারান্টি এই ধারণা বদ্ধমূল হবে এবং তাদের মনে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

তাবলীগে দীনের প্রতিক্রিয়া

আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা), আল্লাহর কিতাব ও আখিরাত সম্পর্কে যারা সন্দিহান কিংবা উদাসীন তারা ইসলামের কথা পছন্দ করে না।

যারা সুদ, ঘুষ, জুয়া ইত্যাদি প্রক্রিয়া দ্বারা অগণিত মানুষকে শোষণ করে টাকার পাহাড় গড়েছে তারা ইসলামের কথা পছন্দ করে না।

যারা লম্পট, অগণিত নারীর দেহ ভোগ করতে অভ্যস্ত, তারা ইসলামের কথা পছন্দ করে না।

যারা মদ ও অন্যান্য নেশাদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত তারা ইসলামের কথা পছন্দ করে না।

যারা দুর্নীতির মাধ্যমে অগণিত মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তারা ইসলামের কথা পছন্দ করে না।

যারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদিতে জড়িত তারা ইসলামের কথা পছন্দ করে না।

যারা আত্মম্ভরী ও যুলুমবাজ তারা ইসলামের কথা পছন্দ করে না।

যারা গণ-মানুষের প্রভু সেজে বসেছে ও গণ-মানুষকে নিজেদের দাস মনে করে তারা ইসলামের কথা পছন্দ করে না।

এইসব লোক ইসলামের উত্থানের মাঝে নিজেদের পতন দেখতে পায়। তাই তাবলীগে দীনের কাজ চলতে দেখলে তারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এইসব লোকের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তারা নানা রকমের চক্রান্ত আঁটে। অ-

নেতৃস্থানীয়রা তাদের হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নানাভাবে তারা তাবলীগে দীনের কাজ স্তব্ধ করে দিতে চায়।

- ইসলামের মুবাল্লিগদেরকে তারা টিটকারী দেয়।
- তাদেরকে গালমন্দ করে।
- তাদেরকে ধমকায়।
- তাদেরকে বিভিন্ন মন্দ উপাধি দেয়।
- মিথ্যা রটনা করে তারা লোকদেরকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়।
- প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে তারা গণ-মানুষকে বিভ্রান্ত করে।
- তারা মুবাল্লিগদের ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে।
- তাদের ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণ চালায়।
- তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে।
- তাদেরকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

বড়োই দুর্ভাগা এই মানুষগুলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহের পতাকা উড়ায়। আল্লাহর সৈনিকদেরকে তারা নাজেহাল করে। আখিরাতের মহাশাস্তিকে তারা নিজেদের জন্য অবধারিত করে নেয়।

ইসলামী রাষ্ট্রে উত্তরণ

এই কষ্টদায়ক পরিস্থিতি ইসলামের মুবাল্লিগদেরকে দুইটি পরীক্ষার সম্মুখীন করে। প্রথমটি ঈমানের পরীক্ষা। দ্বিতীয়টি যোগ্যতার পরীক্ষা।

ইসলামী জীবন দর্শনে যারা ঈমান স্থাপন করে, ইসলামের রঙে যারা জীবন রাঙিয়ে নেয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজকে যারা জীবন-মিশন মনে করে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তোষ অর্জন করে জান্নাত লাভকে যারা জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য বানিয়ে নেয় ইসলামের দুশমনদের সৃষ্ট বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতার তারা কোন তোয়াক্কা করে না। প্রতিকূল পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে তারা ঘাবড়ে যায় না।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তারা থেমে যায় না। তাবলীগে দীনের কাজ বন্ধ করে দেয় না। তারা গণ-মানুষের কাছে পৌঁছার জন্য ও নিজেদের বক্তব্য পৌঁছানোর জন্য নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে। আর এইভাবে কর্ম-কৌশল উদ্ভাবন

করার ভেতর দিয়ে তাদের যোগ্যতার বিকাশ ঘটে। তারা যে যোগ্য মানুষ তার প্রমাণ মেলে।

ইসলামের মুবাল্লিগদের বক্তব্য, তাদের সুন্দর চরিত্র, অত্যাচার-নিপীড়নের মুখেও ইসলামের ওপর তাদের দৃঢ়তা, ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিতেও তাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সমাজের মানুষের মনে কৌতূহল ও প্রশ্ন সৃষ্টি করে। কি কারণে এই নেক মানুষগুলো এইভাবে নির্যাতিত হচ্ছে তা জানার জন্য তাদের মন উন্মুখ হয়ে উঠে। একদিকে চলতে থাকে বিরুদ্ধবাদীদের উগ্র মিথ্যা প্রচারণা, অন্যদিকে চলতে থাকে নেক লোকগুলোর পক্ষ থেকে ইসলামের শান্ত ও শোভন উপস্থাপনা।

ইসলামের দুশমনেরা মিথ্যার যেই ধূম্রজাল সৃষ্টি করে রাখে তার আবরণ ভেদ করে সম্মুখে নিপতিত হতে থাকে মানুষের দৃষ্টি। তাদের সামনে ক্রমশ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

মানুষ উপলব্ধি করতে শুরু করে যে, পার্থিব কোন স্বার্থ হাছিলের জন্য নয়, একটি মহান জীবনাদর্শকে বিজয়ী করার জন্য এই লোকগুলো অহর্নিশ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মানুষ আরো উপলব্ধি করতে শুরু করে যে যারা এই নেক লোকগুলোর বিরোধিতা করছে তারা যালিম। এই নেক লোকগুলো মাযলুম। অন্যায়ভাবে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

এইভাবে মানুষের বিবেক জেগে ওঠে। মুবাল্লিগদের প্রতি তাদের মনে সহানুভূতির ফলগুধারা সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে যারা সাহসী তারা মুবাল্লিগদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। মুবাল্লিগদের সাথে হাত মিলায়। মুবাল্লিগদের কাতারে শামিল হয়।

এইভাবেই চলতে থাকে তাবলীগে দীন।

এইভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে জনশক্তি।

এইভাবেই শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

এইভাবেই বিকল্প শক্তি হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের উত্থান ঘটে।

এই আন্দোলন যখন একদিকে সমাজের নিয়ামক শক্তিগুলোর উল্লেখযোগ্য অংশকে সাথে পায়, অন্যদিকে গণ-ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হয়, তখনই রাষ্ট্র-সংগঠনে তার উত্তরণ ঘটে।

ইসলামী নেতৃত্ব

আল ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত দীন বা জীবন বিধান। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে বলে ইকামাতে দীন। কোন একটি ভূখন্ডে সমাজের সকল স্তরে, সকল দিক ও বিভাগে ইসলামী বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলেই বলতে হবে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কায়েমের প্রচেষ্টা চালিয়ে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই হচ্ছে মুমিন জীবনের আসল লক্ষ্য। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কখনো আপনা আপনি কায়েম হয়ে যায় না। এর জন্য প্রয়োজন আন্দোলন। আর আন্দোলন মানে হচ্ছে লক্ষ্য হাসিলের জন্য একদল মানুষের সমন্বিত প্রয়াস।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কায়েমের আন্দোলনকে বলা হয় আল্লাহর পথে জিহাদ। বাংলা ভাষায় 'ইসলামী আন্দোলন' পরিভাষা আল্লাহর পথে জিহাদকেই বুঝায়। আন্দোলনের জন্য চাই সংগঠন। নেতৃত্ব এবং একদল কর্মী না হলে সংগঠন হয় না। সংগঠনে বহু সংখ্যক কর্মী থাকে। নেতার সংখ্যা থাকে কম। কম সংখ্যক হলেও নেতৃত্বকেই সংগঠনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।

১. ইসলামী নেতৃত্ব ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নবীদের উত্তরসূরী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দূর অতীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার জন্য নবী রাসূলদেরকে পাঠিয়েছিলেন। আদম (আ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত বহু সংখ্যক নবী রাসূল পৃথিবীর বিভিন্ন ভূ-খন্ডে আবির্ভূত হয়ে আল্লাহ-প্রদত্ত জীবন বিধান আল ইসলামকে মানব সমাজে কায়েম করার আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এই প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন, "আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম (যাতে) আমার নির্দেশে তারা লোকদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়।" আল আম্বিয়া।।৭৩

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী আবির্ভূত হবেন না। কিন্তু তাঁর প্রতি নাযিলকৃত আল কুরআন এবং সেই আল কুরআনকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাহ অবিকৃতভাবে বিদ্যমান। আল্লাহর রাসূলের (সা) ইন্তিকালের পর যুগে যুগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতৃত্ব আল ইসলামকে আল্লাহর যমীনে কায়েম করার জন্য বিভিন্ন ভূ-খন্ডে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। আজো সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। যেইসব মহান ব্যক্তি

আল্লাহর রাসূলের (সা) দেখানো পদ্ধতিতে আল ইসলামকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নবী রাসূলদের উত্তরসূরীর ভূমিকাই পালন করছেন।

এই নিরিখে বিচার করলে ইসলামী নেতৃত্বের রয়েছে একটি বড়ো মর্যাদা। সেই কারণে তাঁদের দায়িত্ব বড়ো। তাঁদের সব সময় সজাগ থাকা উচিত যাতে তাঁদের কথা, কাজ এবং আচরণে এমন কিছু প্রকাশ না পায় যা নবীর উত্তরসূরীর জন্য শোভনীয় নয়।

২. 'কথার অনুরূপ কাজ' ইসলামী নেতৃত্বের প্রধান ভূষণ

অনুগামী ও কর্ম এলাকার লোকদের মাঝে আল ইসলামের জ্ঞান বিতরণ ইসলামী নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান কাজ। কিন্তু অনুগামীগণ কিংবা কর্ম এলাকার লোকেরা যদি নেতৃত্বের বাস্তব জীবনে আল ইসলামের অনুশীলন দেখতে না পায়, শুধু মুখের কথা শুনেই তারা অনুপ্রাণিত হয় না। যেই সব নেতা মুখে সুন্দর সুন্দর কথা বলেন অথচ তাঁদের জীবনে সেই সব সুন্দর কথার প্রতিফলন থাকেনা, লোকেরা তাঁদেরকে কপট নেতা গণ্য করে। এই ধরনের নেতৃবৃন্দ কখনো লোকদের শ্রদ্ধাভাজন হতে পারেননা। কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য লোকেরা কখনো কখনো তাঁদের কথা মেনে নিতে বাধ্য হলেও তাদের অন্তরে এই সব নেতার প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ, কোন ভালোবাসা থাকে না।

লোকেরা যখন দেখতে পায় যে নেতাগণ যেইসব কাজ করার জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন, তাঁরা নিজেরাও সেইসব কাজ করে থাকেন, তখন তারা নেতাদেরকে নীতিবান নেতা বলে স্বীকার করে, তখন তারা তাঁদের কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। নীতিবান নেতৃত্বের নিরাপোষ ভূমিকাই সাধারণ লোকদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকে। এমন নেতৃত্বের নির্দেশ মতো কাজ করতে তারা উৎসাহ বোধ করে।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) আল কুরআনের শিক্ষা লোকদের সামনে পেশ করতেন। লোকেরা দেখতে পেতো যে তিনি যেই শিক্ষার কথা মুখে উচ্চারণ করছেন সেই শিক্ষা অনুযায়ীই তাঁর জীবন পরিচালনা করছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর জীবন ছিলো আলকুরআনেরই জীবন্ত রূপ। বৈসাদৃশ্যহীন, বৈপরীত্যহীন পরিচ্ছন্ন জীবন তাঁকে অসাধারণ করে তুলেছিলো, তাঁকে অনুকরণীয় অনুসরণীয় করে তুলেছিলো।

'কথার অনুরূপ কাজ' না করা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত। এমন চরিত্রের লোকদের সমালোচনা করেই তিনি বলেন, 'ওহে যারা ঈমান এনেছো, যেই কাজ তোমরা নিজেরা করনা তা বল কেন? আল্লাহর নিকট এটি গর্হিত কাজ যে তোমরা এমন কথা বল যা তোমরা করনা।' আস সাফ।।২,৩

ইসলামী নেতৃত্বকে অবশ্যই পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে হবে। তাঁদের কথা ও কাজের মাঝে যাতে কোন বৈপরীত্য না থাকে সেই ব্যাপারে তাঁদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। 'কথার অনুরূপ কাজ'ই তাঁদেরকে লোকদের নিকট শ্রদ্ধাস্পদ করে তুলবে। নেতৃত্ব যদি লোকদের স্বতঃস্ফুর্ত শ্রদ্ধা কুড়াতে না পারেন তবে তো তাঁদেরকে ব্যর্থ নেতৃত্বই বলতে হবে।

৩. মানুষের কল্যাণ কামনা ইসলামী নেতৃত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট

ইসলামী নেতৃত্ব মানুষের সুখ, শান্তি এবং কল্যাণের কথা ভেবে থাকেন। তাঁরা নিশ্চিত যে মানব রচিত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করে মানুষের সুখ, শান্তি এবং কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। মানুষের দুনিয়ার জীবনের কল্যাণ এবং আখিরাতের জীবনের নাজাতের কথা ভেবেই তাঁরা পেরেশান। কল্যাণ এবং মুক্তির পথে মানুষকে নিয়ে আসার জন্যই তাঁরা তৎপর।

প্রাচীন ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলে আবির্ভূত হয়ে ছিলেন নূহ (আ)। তিনি লোকদেরকে বলেন, 'আমি তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম পৌঁছাই। আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। আমি আল্লাহর নিকট থেকে এমন সব বিষয় জানি যা তোমরা জান না'। আল আ'রাফ।।৬২

প্রাচীন আরবের আদ জাতির নিকট প্রেরিত হয়ে ছিলেন হূদ (আ)। তিনি লোকদেরকে বলেন, 'আমি তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম পৌঁছাই। আমি তোমাদের নির্ভরযোগ্য কল্যাণকামী।' আল আ'রাফ ।।৬৮

প্রাচীন আরবের আরেক জাতি ছিলো সামূদ জাতি। এই জাতির নিকট প্রেরিত হন সালিহ (আ)। লোকদেরকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, 'ওহে আমার কাউম, আমি তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের কল্যাণই চেয়েছি। কিন্তু তোমরা তো কল্যাণকামীদেরকে পছন্দ করনা।' আল আ'রাফ ।।৭৯

প্রাচীন আরবের উত্তরাঞ্চলে বাস করতো মাদইয়ান জাতি। এদের নিকট প্রেরিত হন শুয়াইব (আ)। তিনি লোকদেরকে ডেকে বলেন, 'ওহে আমার কাউম, আমি আমার রবের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের কল্যাণ চেয়েছি।' আল আ'রাফ।।৯৩

তাঁদের মতো সকল নবীই মানুষের কল্যাণকামী ছিলেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভের পূর্বেও ছিলেন একজন অসাধারণ মানবদরদী মানুষ। মানুষের কল্যাণকামী ছিলেন বলেই তিনি সতর বছর বয়সে হিলফুল ফুদুল নামক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ছিলেন।

চল্লিশ বছর বয়সে জাবালে নূরের হিরা গুহায় অবস্থান কালে জিবরীলকে (আ) দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। বাড়িতে ছুটে এসে স্ত্রী খাদীজাহ বিনতু খুয়াইলিদকে বলেন তাঁর গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিতে। কিছুক্ষণ পর তাঁর গায়ের কম্পন দূর হয়। তিনি স্ত্রীকে বলেন, 'আমার তো জীবনের ভয় ধরে গেছে।' খাদীজাহ (রা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "আপনি আশ্বস্ত হোন, আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করে থাকেন। সর্বদা সত্যকথা বলেন। অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। নিজের উপার্জিত অর্থ দরিদ্রদেরকে দান করেন। ভালো কাজে লোকদের সহযোগিতা করেন।"

খাদীজাহ বিনতু খুয়াইলিদের (রা) বক্তব্যে মানব দরদী, মানুষের কল্যাণকামী মুহাম্মাদের (সা) পরিচয় ফুটে ওঠেছে। আর তিনি যখন নবী হলেন তখন তো আরো বেশি মানবদরদী হয়ে ওঠেন। শুধু দুনিয়ার জীবন নয় মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনেও মানুষ যাতে সুখী হতে পারে সেই জন্য তিনি লোকদেরকে আল্লাহর পথে এগিয়ে আসার আহবান জানাতে থাকেন।

আল্লাহর পথ পরিহার করে মানুষ যখন ইবলীসের পথে চলে তখন তাদের জীবনে সৃষ্টি হয় অসংখ্য জটিলতা। সমস্যার আবর্তে তারা ঘুরপাক খেতে থাকে। অশান্তির আগুনে তারা পুড়তে থাকে। তদুপরি আখিরাতের কঠিন আযাব তো তাদের জন্য অপেক্ষমান।

এই অবস্থা দেখে ইসলামী নেতৃত্ব কখনো উল্লসিত হন না। মনের গভীরে তাঁরা দারুণ ব্যথা অনুভব করেন। দুঃখী মানুষের দুঃখ বেদনা লাঘবের জন্য তাঁরা এগিয়ে আসেন। মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য মানুষের চিন্তা-চেতনা থেকে জাহিলিয়াহর মূলোৎপাটন করে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে কল্যাণময় সমাজ গঠনের উপাদানে পরিণত করার চেষ্টা চালাতে থাকেন।

ইসলামী নেতৃত্ব জানেন যে মানুষের মন্দ আচরণের মূলে রয়েছে মন্দ চিন্তা-চেতনা। এই মন্দ আচরণ দেখে মানুষকে ঘৃণা না করে মানুষের মন্দ চিন্তা-চেতনা দূর করার দিকেই তাঁরা নজর দেন। কারণ মন্দ চিন্তা-চেতনা দূর হলেই মানুষের জীবন থেকে মন্দ আচরণ বিদূরিত হয়।

ইসলামী নেতৃত্বই মানুষের প্রকৃত কল্যাণকামী। দুর্ভাগা মানুষেরা এই মহা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে তারা তাদের কল্যাণকামীদেরকেই তাদের দুশমন মনে করে এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকে। ইসলামী নেতৃত্ব এই দুর্ভাগাদের প্রতি দরদী এবং ক্ষমাশীল মন নিয়ে তাকান। দিনরাত তাদের কল্যাণের কথাই ভাবেন। যাঁদের অন্তরে মানব প্রেমের ফলগুধারা নেই ইসলামী নেতা হওয়ার যোগ্যতা তাঁদের নেই। 'রাহমাতুললিল আলামীনের' উত্তরসূরী হওয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট তাঁদের মাঝে নেই।

৪. ইসলামী নেতৃত্বের বুনিয়াদী কাজ ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন

ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য চাই ইসলামী ব্যক্তিত্ব। যাদের জীবনে ইসলাম নেই তারা সমাজে ইসলাম কায়েম করবেন কিভাবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যেই পর্যন্ত না তারা তাদের বৈশিষ্ট পরিবর্তন করে।" আর রাদ।।১১

এই আয়াতটিতে রয়েছে সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ইসলামী কনসেপ্ট। এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে একটি জাতির ব্যক্তিবর্গ তাদের জীবনধারা যেইভাবে গড়ে তোলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনে সেই ধারাই বিকশিত হয়। অর্থাৎ কোন জাতিকে যদি সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন করতে হয় তাহলে প্রথমে জাতির লোকদের চরিত্রে পরিবর্তন আনতে হবে। আবার এটাও সত্য যে চিন্তাধারায় পরিবর্তন সাধন না করে কারো চরিত্রে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষের প্রকৃতি। মানুষের জীবনে পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়া একমাত্র তাঁরই জানা।

মেহেরবান আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত তাঁর জীবনদর্শন মানুষের সামনে উপস্থাপন করার দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁদেরকে। নবী রাসূলগণ প্রথমে মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আলোড়িত করতে চেয়েছেন। মানুষের চিন্তাজগতে ইসলামী জীবন দর্শনের বীজ বপন করার চেষ্টা করেছেন। যাদের চিন্তাজগত ইসলামী জীবন দর্শন ধারণ করেছে তাদের কর্মজগতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মেই।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি উম্মীদের জন্য তাদের

শুনায়, তাদের তাযকিয়া করে এবং তাদেরকে আল কিতাব ও আল হিকমাহ্ শিক্ষা দেয়।' আল জুমুআহ।।২

'যেমন আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছি যাতে সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে আল কিতাব ও আল হিকমাহ্ শিক্ষা দেয় একং যেই সব কথা তোমাদের জানা ছিলোনা তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়।' আল বাকারাহ।।১৫১

'আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল বানিয়েছেন যে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে আলকিতাব ও আল হিকমাহ্ শিক্ষা দেয়।' আলে ইমরান।।১৬৪

মুহাম্মাদ (সা) সর্ব শেষ নবী। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আল কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কিয়ামাত পর্যন্ত আলকুরআনকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মহানবীর (সা) দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওআতী জিন্দেগীর যাবতীয় কর্মকান্ডের বিবরণও অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে।

এই যুগের ইসলামী নেতৃত্বের কর্তব্য হচ্ছে মহানবীর (সা) অনুকরণে আল কুরআনকে মানুষের সামনে পেশ করা, আল কুরআনে উপস্থাপিত জীবনদর্শনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং আল কুরআন ও আল হাদীসের আলোকে জীবনকে ঢেলে সাজানোর জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। যারা আল কুরআনের জীবনদর্শনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে তারাই খাঁটি মুমিন। আর এই মুমিনগণ যাবতীয় গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থেকে এবং যাবতীয় নেক আমল অনুশীলন করে তাদের জীবনকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে নিক, এটাই আল্লাহর অভিপ্রায়।

কোন ভূ-খন্ডের বিপুল সংখ্যক লোক যখন এইভাবে গড়ে ওঠে তখনই তৈরী হয় ইসলামী গণ ভিত্তি। আর এই গণ ভিত্তি ইসলামী সমাজ নির্মাণের বুনিয়াদ। ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন হচ্ছে ইসলামী নেতৃত্বের বুনিয়াদী কাজ।

৫. কঠোরতা নয় কোমলতা অবলম্বনই ইসলামী নেতৃত্বের প্রধান সাংগঠনিক নীতি

ইসলামী আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের অনুগামীদের প্রতি খুবই কোমল ছিলেন। তাঁরা অনুসারীদের সাথে কঠোর আচরণ করতেন না।

তাদের সাথে কর্কশ ভাবে কথা বলতেন না। তাদেরকে তিরস্কার করতেন না। তাদেরকে গালমন্দ করতেন না।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের (সা) জীবন চরিত বিস্তারিতভাবে লিখিত রয়েছে। তাঁর জীবনে মন্দ আচরণের কোন উদাহরণ নেই। তিনি অনুগামীদেরকে তাদের আগেই সালাম দিতেন। হাসিমুখে তাদের সাথে কথা বলতেন। কখনো রাগান্বিত হলে তিনি তা কাউকে বুঝতে দিতেন না। তিনি যখন রাগতেন চেহারায় রক্তিমাভা ফুটে ওঠতো। চেহারায় ঘাম দেখা দিতো। এ থেকে লোকেরা আন্দাজ করতো যে রাসূলুল্লাহ (সা) রাগান্বিত হয়েছেন। রাগান্বিত অবস্থায় তিনি কাউকে বকাঝকা করতেন না। কটুকথা বলতেন না।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সা) সম্বোধন করে বলেন, 'ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর।' আল আ'রাফ।।১৯৯

অনুগামীদের প্রতি তিনি সব সময়ই ছিলেন সহনশীল ও ক্ষমাশীল। তিনি ছিলেন 'মুমিনদের প্রতি দরদী ও করুণাসিক্ত।' আত তাওবাহ।।১২৮

আল্লাহর রাসূলের (সা) অনুগামীগণ মানুষই ছিলেন। ফলে তাঁদের ভুলভ্রান্তি হতো। কিন্তু তাঁদের ভুল ভ্রান্তি দেখে তিনি ক্ষেপে ওঠতেন না। সংশোধনের লক্ষ্যে বিনম্র ভাষায় তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

তাঁর কথা ও কাজে ছিলো মাধুর্য। তাঁর অমায়িক ব্যবহার তাঁকে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলো। তাঁর মুখের মধুর বাণী শুনার জন্য, তাঁর সান্নিধ্যে থেকে প্রাণ জুড়াবার জন্য যখনই সুযোগ পেতো তাঁর অনুগামীগণ তাঁর কাছে ছুটে আসতো। তারা সহজে তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করতে চাইতো না। মহানবীর (সা) আচরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ নিজেই বলেন, 'এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে তুমি তাদের প্রতি নম্র স্বভাবের হয়েছো। যদি তুমি কঠোর ভাষা ও কঠোর চিত্তের লোক হতে লোকেরা তোমার চারদিক থেকে ভেগে চলে যেতো।' আলে ইমরান।।১৫৯

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, কিন্তু পরস্পর রহমদিল।' আল ফাতহ।।২৯

'কাফিরদের প্রতি কঠোর মানে এই নয় যে, তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতো। বরং কাফিরদের অনুসৃত মত ও পথের প্রতি তাদের ভূমিকা ছিলো নিরাপোষ। আবার কাফিরগণ যখন তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিতো তখন ইস্পাতের দৃঢ়তা নিয়ে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করতো। কিন্তু এই ইস্পাত কঠিন মানুষগুলো যখন একের সাথে অপরজন মেলামেশা করতো, আলাপ করতো, তখন একটি মধুর

পরিবেশ সৃষ্টি হতো। তাদের আচরণে সহমর্মিতা ও প্রীতি সম্প্রীতির উষ্ণতা প্রকাশ পেতো।

পরবর্তীকালের ইসলামী নেতৃত্ব যাতে অনুগামীদের প্রতি কোমল আচরণ করে সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন, 'নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল ওই ব্যক্তি যে অধীন ব্যক্তিদের প্রতি কঠোর। তোমরা সাবধান থাকবে যাতে তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়।' সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম

আয়িশাহ (রা) বলেন যে নবী (সা) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতা ভালোবাসেন। তিনি কোমলতা দ্বারা ওই জিনিষ দান করেন যা কঠোরতা দ্বারা দান করেন না।' সহীহ্ মুসলিম।

এই যুগের ইসলামী নেতৃত্বকেও আল কুরআন ও আল হাদীসের আলোকে উদারতা- ক্ষমাশীলতা-কোমলতাকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁদের অনুগামীদের সাথে আচরণ করা উচিত। ইসলামী শারীয়াহ্র বিধান লংঘন করার কারণে আল্লাহ্ রাসূল (সা) তাঁর কোন কোন অনুগামীকে কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু ওই ব্যক্তিদেরকেও তিনি গালমন্দ করেননি। তাদের সাথে অশোভন আচরণ করেননি।

এই যুগের ইসলামী নেতৃত্বকেও তাঁদের অনুগামীদের কারো কারো বিরুদ্ধে বিশেষ কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। এতদসত্বেও তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণ বিন্দুমাত্র অভদ্রজনোচিত হবেনা।

সংগঠনের সকল কর্মী একই মানের থাকেনা। তাই সকলের কাজও একই মানের হয়না। মেধার পার্থক্য, বয়সের পার্থক্য, সুস্থতা-অসুস্থতা, সমস্যার স্বল্পতা কিংবা আধিক্য ইত্যাদি কারণে সকলের কাজের মান এক হবে না, হতে পারে না।

বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্বকে অনুগামীদের ওপর বিশেষ বিশেষ কাজ চাপাতে হয়। কাজ চাপানোর আগে উপরোক্ত বিষয়গুলো ভালো ভাবে বিবেচনা করে সঠিক ব্যক্তির ওপর সঠিক কাজ চাপানো উচিত। কাজ চাপানোর আগেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিষয় ভালোভাবে অবহিত হয়ে তবেই কাজ চাপানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

৬. শূরা ইসলামী নেতৃত্বের নিরাপত্তা বেষ্টনী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নেতৃত্বকে নির্দেশ প্রদানের অধিকার দান করেছেন। নেতৃত্বের নির্দেশ পালন অনুগামীদের ওপর ফারয করেছেন। নেতৃত্ব কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যই অনুগামীদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। যদিও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদানের অধিকার নেতৃত্বকে দেয়া হয়েছে কিন্তু

এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেতৃত্বকে দেয়া হয়নি। মহাবিজ্ঞ আল্লাহ বলেন, 'তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হয়।' আশ শূরা।।৩৮

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যক্তিগতভাবে খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। নবী হওয়ার পূর্বেই কা'বা সংস্কারের পর হাজরে আসওয়াদ যথাস্থানে সংস্থাপনের জন্য বিবদমান গোত্রগুলোর বিবাদ তিনি যেইভাবে মীমাংসা করেছিলেন তাতে তাঁর অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে। কিন্তু এই বিচক্ষণ ব্যক্তিটির প্রতিও আল্লাহর নির্দেশ ছিলো, 'সামষ্টিক বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর।' আলে ইমরান।।১৫৯

যেই বিষয়ে আল্লাহ ওহী পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) নির্দেশ দিতেন না সেই সব বিষয়ে তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন। বদর প্রান্তরে পৌঁছে একটি স্থান দেখিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে তাঁবু স্থাপন করতে বলেন। যুদ্ধ বিশারদ সাহাবীগণ জানতে চান যে ওই স্থানে তাঁবু স্থাপনের জন্য তিনি কি আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট । রাসূলুল্লাহ (সা) না সূচক জবাব দিলে তাঁরা অপর একটি স্থানের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলেন যে তাঁদের মতে যুদ্ধ কৌশলের দৃষ্টিতে ওই স্থানটিতে তাঁবু স্থাপন করলে ভালো হয়। আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় স্থানটিতে তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দেন।

উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মাসজিদে নববীতে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতে বসলেন আল্লাহর রাসূল (সা)। বিবেচ্য বিষয় ছিলো : শহরে অবস্থান করে যুদ্ধ করা, না শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা। অধিকাংশ সাহাবী শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করে আল্লাহর রাসূল (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে উহুদ প্রান্তরে গিয়ে সৈন্য সমাবেশ করেন।

যেই সব সিদ্ধান্তের সাথে বহু সংখ্যক লোকের ভাগ্য জড়িত সেই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাদের সকলের অথবা তাদের প্রতিনিধিদের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

আন্দোলনের জীবনে এমন সময়ও আসে যখন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এমন সিদ্ধান্ত নেতৃত্ব যদি একা একা গ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যদি জান ও মালের বিপুল ক্ষতি হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে নেতৃত্বকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে। ব্যর্থতার সব গ্লানি তাঁদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা হতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্তটা যদি সকলের সাথে কিংবা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করে গ্রহণ করা হয় তখন নেতৃত্বের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে না কেউ।

তাছাড়া এটা অনস্বীকার্য যে বহু সংখ্যক লোক বিভিন্ন দিক দেখে শুনে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটাই স্বাভাবিক। একজন মাত্র ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর দ্বারা একটি বেঠিক সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়ে যেতে পারে। দুনিয়ার ডিকটেটারদের ইতিহাস তার সাক্ষী। দুনিয়াতে যেইসব ডিকটেটারের আবির্ভাব ঘটেছে তারা কিন্তু বোকা লোক ছিলো না। তাদের বহু সিদ্ধান্তই সঠিক ছিলো। কিন্তু একা একা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তারা কখনো কখনো এমন সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যা এক দিকে তাদের নিজের জন্য, অপরদিকে তাদের জাতির জন্য বড়ো রকমের অকল্যাণ ডেকে এনেছে। তারা ধিকৃত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে। তাদের কারো কারো অপমৃত্যু ঘটেছে।

মহান আল্লাহর নির্দেশে ইসলামী নেতৃত্বকে শূরা বা পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই তাদেরকে ডিকটেটারদের করুন পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়না। সেই জন্যই বলছিলাম, শূরা ইসলামী নেতৃত্বের নিরাপত্তা বেষ্টনী।

৭. বাগ্মিতা ইসলামী নেতৃত্বের শানিত হাতিয়ার

বক্তৃতা-ভাষণের যোগ্যতাই বাগ্মিতা। বক্তৃতা-ভাষণের মাধ্যমেই নবী রাসূলগণ তাঁদের কাউমের নিকট ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কিত বিভিন্ন কনসেপ্ট তুলে ধরেন। সকল নবীই ছিলেন সুবক্তা।

মূসা (আ) ভালো বক্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁর বড়ো ভাই হারুন ছিলেন আরো বেশি ভালো বক্তা। আদদাওআতু ইলাল্লাহর কাজ করার জন্য বক্তৃতা-ভাষণের পারদর্শিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর হারুন যেহেতু এই ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন সেহেতু মূসা (আ) আল্লাহর নিকট আবেদন রাখেন যাতে হারুনকে তাঁর সহযোগী বানিয়ে দেন। 'আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বেশি বাগ্মিতা সম্পন্ন, তাকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে পাঠান যাতে সে আমার সত্যতা প্রমাণ করতে পারে।' আল কাছাছ। ।৩৪

দাউদ (আ) এর বাগ্মিতা সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেন, 'আমি তার রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছি, তাকে আলহিকমাহ দান করেছি। আর দিয়েছি চূড়ান্ত বক্তব্য পেশ করার যোগ্যতা।' সাদ। ।২০

অর্থাৎ দাউদের (আ) কথা পেঁচানো ও অস্পষ্ট হতো না। তিনি কি বুঝাতে চান তা বুঝতে কারো কষ্ট হতো না। তিনি যেই বিষয়ে কথা বলতেন তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠতো। আর শ্রোতাদের অন্তর বলে ওঠতো এই বিষয়ে এটাই তো প্রকৃত কথা, এটাই তো চূড়ান্ত কথা।

এই গুণটি কেবল দাউদকে (আ) দেয়া হয়েছিলো তা নয়, অন্যান্য নবী-রাসূলও এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহও (সা) একজন সুবক্তা ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা দীর্ঘ হতোনা। কিন্তু তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাঝেই ভাব ও তত্ত্বজ্ঞান থাকতো অনেক বেশি। এই সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ভাব প্রকাশক বক্তৃতা ভাষণের যোগ্যতাসহ আবির্ভূত হয়েছি।'

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) বিদায় হাজ্জে যেই ভাষণ দেন তা খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই ভাষণের প্রতিটি বাক্যে যেই তাৎপর্য লুকিয়ে আছে তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বড়ো বড়ো গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) বক্তৃতার ভাষা ছিলো প্রাঞ্জল। শব্দগুলো ছিলো সহজ। ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিনি পুনরাবৃত্তি করতেন। প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বক্তব্য রাখতেন। তাঁর বক্তৃতা-ভাষণে আল কুরআনের উদ্ধৃতি প্রাধান্য পেতো।

এই যুগের ইসলামী নেতৃত্বকেও বক্তৃতা-ভাষণে পারদর্শী হতে হবে। তাঁদেরকে আল কুরআন এবং আল হাদীসের জ্ঞান বক্তৃতা ভাষণের মাধ্যমেই অপরাপর মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। কিছু লোক বক্তৃতা-ভাষণের পারদর্শিতা সহজেই আয়ত্ত করতে পারেন। আবার কিছু লোককে তা আয়ত্ব করতে হয় খেটে খুটে। অর্থাৎ বক্তৃতা-ভাষণের প্রশিক্ষণ নিতে হয় তাদেরকে। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুকাল প্র্যাকটিস করলেই ভালো বক্তা হওয়া যায়।

৮. আমানতদারী ইসলামী নেতৃত্বের মর্যাদার গ্যারান্টি

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) বলেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের ওপর যা কিছু ফারয করেছেন তাই আমানত। আর আল্লাহর আদেশ কিংবা নিষেধ অমান্য করাই আমানতের খিয়ানত।' আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, 'সালাত, অযু, গোসল, ক্রয়-বিক্রয়, দাঁড়িপাল্লা সবই আমানত। আর গচ্ছিত সম্পদ হচ্ছে সবচে' বড়ো আমানত।'

নেতা নির্বাচন কালে যোগ্যতম ব্যক্তির পক্ষে নিজের ভোট প্রদান করা আমানতদারীর দাবি। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ নিচ্ছেন আমানতের হকদারের হাতে তা সুর্ফদ করতে।' আন্‌নিসা।।[৫৯]

কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে নিঃসংকোচে নিজের অভিমত ব্যক্ত করা আমানতদারীর দাবি। সঠিক ব্যক্তিদেরকে তালাশ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা আমানতদারীর দাবি। যেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুগামীগণ নেতৃত্বকে

কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছে সেই লক্ষ্যাভিসারী কর্মকাণ্ডে তাদেরকে নিয়োজিত রাখা আমানতদারীর দাবি।

সংগঠনের টাকা-পয়সা, ফাইলপত্র, আসবাব ইত্যাদি ছোট বড়ো সকল সম্পদ সঠিক ভাবে সংক্ষণ করা এবং সংগঠনের লক্ষ্য হাসিলের জন্য ব্যয়-ব্যবহার করা আমানতদারীর দাবি।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, 'মুনাফিকের আলামত তিনটি। যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, এবং তার কাছে কিছু আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে।' সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, 'যাঁর আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। যার ওয়াদা পালন নেই তার দীনদারী নেই'। আহমাদ, সহীহ্ আল বুখারী, তাবরানী

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, 'মানুষের মধ্য থেকে সর্ব প্রথম যেই সদগুণটি তিরোহিত হবে তা হচ্ছে আমানতদারী।' ইসলামী নেতৃত্বকে আমানতদারীর পূর্ণাংগ কনসেপ্ট-এর সাথে পরিচিত হতে হবে। তাঁদেরকে সর্বাবস্থায় আমানতের হিফাজতের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

আমানতের খিয়ানতকারীকে কেউ পছন্দ করে না। তাকে কেউ শ্রদ্ধা করেনা। তার কথায় কেউ আস্থা স্থাপন করেনা। তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য মনে করেনা। তাকে কেউ মর্যাদাবান লোক গণ্য করে না।

পক্ষান্তরে আমানতদার লোককে লোকেরা ভালোবাসে। শ্রদ্ধা করে। তাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করে। তাকে মর্যাদাবান লোক বলে স্বীকার করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে আমানতদারী একজন ব্যক্তির মর্যাদার হিফাজাতকারী হয়ে থাকে। তাই ইসলামী নেতৃত্বকে অবশ্যই সকল বিষয়ে আমানতদার হতে হবে।

৯. যোগ্য উত্তরসূরী সৃষ্টি ইসলামী নেতৃত্বের বড়ো সফলতা

কোন মানুষই দুনিয়ায় অমর নয়। আজ যাঁরা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরাও অমর নন। তাই আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নেতৃত্ব তৈরী করে যাওয়া তাঁদের কর্তব্য। ইব্রাহীম (আ) দুনিয়ার বিশাল এলাকায় আল ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আবার, আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে নেতৃত্ব দেবার জন্য তিনি ইসমাইল (আ), ইসহাক (আ) এবং লূতকে (আ) তৈরী করে গেছেন।

মূসা (আ) বানু ইসরাইলকে নিয়ে ট্রান্স জর্ডনের বিশাল এলাকায় ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর পরবর্তী মানযিল ছিলো ফিলিস্তিন। কিন্তু সেখানে পৌছার

আগেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর হাতে গড়া ইউশা বিন নূন এবং কালিব বানু ইসরাইলকে নেতৃত্ব দিয়ে ফিলিস্তিনে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ২৩ বছরের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে মাদীনাকে কেন্দ্র করে গোটা জাজিরাতুল আরবে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার সাথে সাথে তিনি একদল লোকও গঠন করে যান। তাঁর ইন্তিকালের পর আবু বাকর আসসিদ্দিক (রা), উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), উসমান ইবনু আফফান (রা) এবং আলী ইবনু আবি তালিব (রা) একে একে আমীরুল মুমিনীন হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

বর্তমানে যাঁরা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বে দিচ্ছেন তাঁদেরকে এই বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বিষয়ের তালিকায় রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সংগঠনের জনশক্তিকে স্টাডি করে মৌলিক মানবীয় গুণসম্পন্ন লোক বাছাই করতে হবে।

সাধারণত পরিশ্রমপ্রিয়তা, বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি, সূক্ষ্মদৃষ্টি, প্রখর স্মৃতি শক্তি, প্রশস্তচিত্ততা, স্থির চিত্ততা, ভারসাম্যপূর্ণ মিজায, উদ্ভাবন শক্তি, বাগ্মিতা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা প্রভৃতি গুণকে মৌলিক মানবীয় গুণ বলা হয়। ইসলামী আন্দোলনের জন্য শুধু মৌলিক মানবীয় গুণ যথেষ্ট নয়। এর সাথে সমন্বিত থাকতে হবে চিন্তার বিশুদ্ধতা এবং উন্নত নৈতিকতা। নেতৃত্বকে বাছাই করতে হবে মৌলিক মানবীয় গুণ, চিন্তার বিশুদ্ধতা এবং উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন ভারসাম্যপূর্ণভাবে অগ্রসরমান কিছু সংখ্যক কর্মী।

বাছাইকৃত ব্যক্তিদেরকে ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য, প্রকৃতি, নির্বাচন পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, সংশোধন পদ্ধতি, সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি, রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি, হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি শেখাতে হবে।

বাছাইকৃত কর্মীদেরকে বিশুদ্ধভাবে আলকুরআন তিলাওয়াত, উন্নত মানের দারসুল কুরআন প্রদান এবং আকর্ষণীয় বক্তৃতা-ভাষণ প্রদানের পদ্ধতি শেখাতে হবে। তাদের জন্য বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে তাদের সাথে ব্যক্তিগত আলাপ করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়াও জরুরী। যতো বেশি সম্ভব তাদেরকে সাহচর্য দান করা উচিত।

এইভাবে যাদের পেছনে শ্রম দেয়া হবে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব তাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে।

ইসলামী সংগঠনে নেতা নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

নেতা নির্বাচন

ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মূল নেতা ছিলেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। তাঁরা ছিলেন সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নিযুক্ত। আর সেই কারণে তাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রতি ঈমান পোষণকারীদের আনুগত্য দাবি করার অধিকারপ্রাপ্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا–

"আর আমি তাদেরকে (নবী-রাসূলদেরকে) নেতা বানিয়েছিলাম যাতে তারা আমার নির্দেশে (লোকদেরকে) সঠিক পথের দিশা দেয়।" (আল-আম্বিয়া ॥ ৭৩)

আল-কুরআনের সূরা আশ্-শূয়ারা-তে বিভিন্ন নবীর তৎপরতার বিবরণে আমরা পাই যে, তাঁরা লোকদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তাঁদের আনুগত্য করে জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ "অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।"

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নিযুক্ত নেতা ছিলেন, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নেতা নন। আর মহান আল্লাহ্ই মানুষকে তাঁদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এই নির্দেশ মানুষকে অবহিত করে তাঁরা তাদের আনুগত্য দাবি করেছেন।

জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত না হওয়া সত্ত্বেও নেতৃপদ লাভ করা ও মানুষের আনুগত্য দাবি করা ছিলো নবীগণের একটি বিশেষ অধিকার। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বশেষ নবী হওয়ার কারণে আর কোন মানুষের পক্ষে এইভাবে নেতৃপদ লাভ করে মানুষের আনুগত্য দাবি করার কোন সুযোগ নেই।

এখন ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনে মুসলিমগণই তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচিত করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর আনুগত্য করতে থাকবেন।

'আমীর' একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। সাধারণত ইসলামী সংগঠনের নেতাকে আমীর বলা হয়। আর ইসলামী রাষ্ট্রের নেতাকে বলা হয় আমীরুল মু'মিনীন।

তবে কোন কোন ইসলামী সংগঠনে 'আমীর' পরিভাষার পরিবর্তে অন্য কোন পরিভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ইসলামী সংগঠনের নেতা হন একজন নির্বাচিত ব্যক্তি। একজন ব্যক্তি যতোই প্রতিভাবান বা যোগ্যতা সম্পন্ন হোন না কেন, তিনি নিজেকে আমীর ঘোষণা করে অন্যদের আনুগত্য দাবি করবেন, ইসলামী জীবন বিধানে এর কোন অবকাশ নেই। ইসলামী সংগঠনে নেতৃত্ব পদ চাওয়া নিষিদ্ধ। মহানবী (সা) বলেছেন,

إِنَّا وَاللهِ لاَنُوَلِّىْ عَلٰى هٰذَا الْعَمَلِ اَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَاَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ-

"আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই আমরা নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব এমন ব্যক্তির ওপর অর্পণ করবো না যে তা চায় কিংবা যার অন্তরে তার লোভ রয়েছে"। (সহীহ মুসলিম, সহীহ্ আল-বুখারী)

উল্লেখ্য যে, কোন কোন ব্যক্তি বলেন, আল-কুরআনই তো আমাদেরকে নেতৃত্ব পদ চাইতে উৎসাহিত করে। وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا "আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানান" আয়াতাংশকে তাঁরা তাঁদের প্রমাণ হিসেবে পেশকরেন।

আল-কুরআনের এই আয়াতাংশ দ্বারা যদি নেতৃত্ব পদ চাওয়ার উৎসাহ প্রদান বুঝানো হতো তাহলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আল-কুরআনের বিপরীত অর্থ প্রকাশক বক্তব্য পেশ করতেন না। তদুপরি মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ বিনা দ্বিধায় নেতৃত্ব পদ চাইতেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম চার ব্যক্তিত্ব আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা), উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), উসমান ইবনু আফফান (রা) ও আলী ইবনু আবী তালিব (রা) নেতৃত্ব পদ চাননি, বরং জনগণই তাঁদের ওপর নেতৃত্ব পদ চাপিয়ে দিয়েছে। আজও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে খাঁটি ইসলামী সংগঠনগুলোতে নেতৃত্ব পদ চাওয়ার কোন নিয়ম প্রচলিত নেই।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেন,

"অর্থাৎ তাকওয়া- আল্লাহভীতি ও আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমরা সবার চেয়ে এগিয়ে যাবো। কল্যাণ ও সৎ কর্মশীলতার ক্ষেত্রে সবার অগ্রগামী হবো। নিছক সৎ কর্মশীলই হবো না বরং সৎ কর্মশীলদের নেতা হবো এবং আমাদের

বদৌলতে সারা দুনিয়ায় কল্যাণ ও সৎ কর্মশীলতা প্রসারিত হবে। এই কথার মর্মার্থ এই যে এরা এমন লোক যারা ধন দওলত ও গৌরব-মাহাত্মের ক্ষেত্রে নয় বরং আল্লাহভীতি ও সৎ কর্মশীলতার ক্ষেত্রে পরস্পরের অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের যুগে কিছু লোক এই আয়াতাংশটিকে নেতৃত্ব লাভের জন্য প্রার্থী হওয়া ও রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের জন্য অগ্রবর্তী হওয়ার বৈধতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের মতে এই আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, "হে আল্লাহ, মুত্তাকীদেরকে আমাদের প্রজা আর আমাদেরকে তাদের শাসকে পরিণত করুন।" বস্তুত ক্ষমতালোভী ও পদপ্রার্থীরা ছাড়া আর কারো কাছে এই ধরনের ব্যাখ্যা প্রশংসনীয় হতে পারে না।"

দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সূরাহ আল-ফুরকানের তাফসীর, টীকা-৯৩

নেতা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাদের মতামত বা ভোটের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত হন তাদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে একটি কঠিন দায়িত্ব। ইসলামী আদর্শের জ্ঞান, ইসলামী বিধিবিধান অনুশীলনের উচ্চ মান, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে যাকে যোগ্যতম বলে মনে হয়, তাঁর পক্ষে ভোট দেওয়া তাদের কর্তব্য। ভোট বা অভিমতও একটি আমানাত। যোগ্যতম ব্যক্তির পক্ষে তা প্রদান করা হলে আমানাতদারির দাবি পূরণ হয়। এই সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا–

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা যেন যাবতীয় আমানাত তার হকদারের নিকট সুফর্দ কর।" (আন-নিসা ॥ ৫৮)

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন–

اِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا اُسْنِدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ–

"যখন আমানাত বিনষ্ট হতে দেখবে তখন কিয়ামাতের অপেক্ষা করবে।" একজন বললেন,"ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে আমানাত বিনষ্ট করা হবে?" তিনি বললেন, "যখন কোন দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হবে তখন কিয়ামাতের অপেক্ষা করবে।" (সহীহ আল-বুখারী)

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়। সেটি হচ্ছে সমাজ-ব্যবস্থা ভাংগা ও গড়ায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমাজ ভাংগা ও গড়ার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পুরুষদের ওপর অর্পণ করেছেন। আর যেই পুরুষেরা সমাজ ভাংগা ও গড়ায় লড়াকুর ভূমিকা পালন করবে তাদেরকে গড়ার দায়িত্ব দিয়েছেন নারীকে।

সমাজ ভাংগা ও গড়ার প্রথম কাতারের লড়াকু ছিলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম। তাঁদের সকলেই ছিলেন পুরুষ। আবার এই লড়াকু পুরুষদেরকে যাঁরা লালন পালন করে সমাজকে উপহার দিয়েছেন তাঁরা ছিলেন নারী।

যেই সংগঠন পুরাতন সমাজ ভাংগা ও নতুন সমাজ গড়ার সংগ্রাম চালায় তার নেতৃত্ব পুরুষদের হাতেই অর্পিত হবে, এটাই স্বাভাবিকতার দাবি। সেই সংগঠন যখন গণ-ভিত্তি রচনা করে রাষ্ট্র-সংগঠনের রূপ নেবে তখনও তার নেতৃত্ব পুরুষদের হাতেই অর্পিত হবে, এটাও স্বাভাবিকতার দাবি।

তাই ইসলামী সংগঠনে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব নির্বাচন কালে ভোটারদেরকে পুরুষদের মধ্য থেকেই যোগ্যতম ব্যক্তি তালাশ করতে হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ইসলামী আন্দোলন কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে সংগঠনের আমীর কিংবা আমীরুল মুমিনীনকে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু এই সব সিদ্ধান্ত তাঁর একাকী গ্রহণ করার ইখতিয়ার নেই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বস্তুত পরামর্শ আদান-প্রদান বা শূরা ইসলামী জিন্দিগীর অন্যতম বৈশিষ্ট।

আল-কুরআনের এক স্থানে মুমিনদের বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ এই বৈশিষ্টের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ -

"তাদের সামষ্টিক কার্যাবলী পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হয়।" (আশ্-শূরা ॥ ৩৮)

উল্লেখ্য যে, এই আয়াত নাযিল হয়েছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের মাক্কী যুগে। তখন্ ইসলাম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। ঐ যুগে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় দারুল আরকামে

অন্যান্য মুমিনদের সাথে মিলিত হতেন। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, দারুল আরকাম একদিকে ছিল ইসলামী শিক্ষালয়, অন্যদিকে ছিলো পরামর্শ ভবন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) নেতৃত্বে মাক্কায় তেরোটি বছর ধরে চলে ইসলামী আন্দোলন। এরপর সংঘটিত হয় হিজরাত। ইয়াসরিবে (মাদীনা) গণভিত্তি রচিত হওয়ায় গড়ে উঠে ইসলামী রাষ্ট্র। ঐ রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হন মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বিতীয় সনে হয় বদর যুদ্ধ। তার পরবর্তী বছর সংঘটিত হয় উহুদ যুদ্ধ। উহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয় সূরাহ্ আলে ইমরানের বিরাট অংশ। ঐ সূরাহ্‌র একটি আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সামষ্টিক কার্যাবলী নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে মহানবীকে (সা) তাঁর সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেন।

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ -

"সামষ্টিক কার্যাবলীতে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" (আলে ইমরান ॥ ১৫৯)

উল্লেখ্য যে, এই নির্দেশ যখন নাযিল হয় তখন ইসলামী আন্দোলন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াতকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামী সংগঠন পরিচালনায় হোক কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায়, সংগঠন প্রধান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরামর্শের ভিত্তিতে।

পরামর্শ আদান-প্রদান সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কতিপয় হাদীস বিষয়টির গুরুত্ব স্পষ্টতর করে তোলে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন– "যদ্দিন পর্যন্ত তোমাদের শাসক হবে তোমাদের উত্তম ব্যক্তিগণ, তোমাদের ধনী ব্যক্তিরা থাকবে দানশীল এবং তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিষ্পন্ন হবে পরামর্শের ভিত্তিতে তদ্দিন ভূগর্ভের চেয়ে ভূপৃষ্ঠ তোমাদের জন্য উত্তম। যখন তোমাদের শাসক হবে তোমাদের মন্দ ব্যক্তিগণ, তোমাদের ধনীরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অর্পিত হবে মহিলাদের হাতে তখন ভূপৃষ্ঠের চেয়ে ভূগর্ভই তোমাদের জন্য উত্তম।"

আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ–

"যার পরামর্শ চাওয়া হয় তার উপর (সঠিক পরামর্শ পাওয়ার জন্য) নির্ভর করা হয়।" (সুনানু আবী দাউদ)

উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ–

"যার পরামর্শ চাওয়া হয় তার উপর (সঠিক পরামর্শ পাওয়ার জন্য) নির্ভর করা হয়।" (জামে আত্-তিরমিযী)

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "যেই ব্যক্তির কাছে তার মুসলিম ভাই পরামর্শ চায়, সে যদি সত্যের বিপরীত পরামর্শ দেয় তবে সে তার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।" (সুনানু আবী দাউদ)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তবুও তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতেন না। এক হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন–

لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا اَحَدًا مِّنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ لَاَمَّرْتُ ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ–

"আমি পরামর্শ ছাড়া কাউকে নেতৃত্ব পদ দিলে ইবনু উম্মে আবদকেই (আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ) দিতাম।" (জামে আত্-তিরমিযী)

আয়িশাহ (রা) বলেন–

مَارَاَيْتُ رَجُلاً اَكْثَرَ اِسْتَشَارَةً لِلرِّجَالِ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

"আমি এমন কোন ব্যক্তি দেখিনি যিনি রাসূলুল্লাহ্র (সা) চাইতে বেশী পরামর্শ করতেন।" (জামে আত্-তিরমিযী)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فِى الْاَمْرِ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنَا مَعَهُمَا–

"রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে মুসলিমদের সামষ্টিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আবু বাকরের সাথে পরামর্শ করতেন। আমিও তাঁদের সাথে থাকতাম।" (জামে আত্-তিরমিযী)

দৈনন্দিন বিষয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এই দুইজনের সাথে পরামর্শ করতেন। আরো বড় বিষয় হলে তিনি বেশি সংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতনে।

আমীরুল মুমিনীন আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীকের (রা) পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে আমরা নিম্নরূপ বিবরণ পাই।

"আবু বাক্‌র (রা) কোন সমস্যার সমাধানে আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাতে কোন উদাহরণ না পেলে শীর্ষস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের (رُءُوسُ النَّاسِ وَخِيَارُهُمْ) ডেকে পরামর্শ নিতেন।" (সুনানু আদ্‌-দারেমী)

আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা) প্রধানত যাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ (১) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), (২) উসমান ইবনু আফফান (রা), (৩) আলী ইবনু আবী তালিব (রা), (৪) তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা), (৫) আয্‌-যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), (৬) আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রা), (৭) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা), (৮) আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা), (৯) মুয়ায ইবনু জাবাল (রা), (১০) উবাই ইবনু কা'ব (রা), (১১) যায়িদ ইবনু সাবিত (রা)।

দ্রষ্টব্য ঃ আবু বাক্‌র, মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল, পৃ. ৩১০

আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন–

لاَ خِلاَفَةَ إِلاَّ عَنْ مَشْوَرَةٍ.

"পরামর্শ ছাড়া খিলাফাত ব্যবস্থা চলে না।"

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রধান সাহাবীদের (اَشْيَاخُ بَدْرٍ) সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। নবীনদের মধ্যে তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাসকে (রা) শামিল করতেন। (সহীহ আল-বুখারী, ৪৬০১)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) যাঁদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ (১) উসমান ইবনু আফফান (রা), (২) আলী ইবনু আবী তালিব (রা), (৩) তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা), (৪) আয্‌-যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), (৫) আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রা), (৬) মুয়ায ইবনু জাবাল (রা), (৭) উবাই ইবনু কা'ব (রা), (৮) যায়িদ ইবনু সাবিত (রা), (৯) আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)।

দ্রষ্টব্য : শিবলী নুমানী, আল-ফারূক, পৃ. ১৬২-১৬৩। উল্লেখ্য যে, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) তাঁর শাসনকালে সেনাপতি হিসেবে বিভিন্ন সময় দূর রণাঙ্গনে অবস্থান করতেন।

আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনু আফফান (রা) মাজলিসুশ শূরার প্রথম উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "আল-কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্‌র পর আমি আপনাদের এমন সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী থাকবো যা পরামর্শের ভিত্তিতে চূড়ান্ত হয়েছে।"

দ্রষ্টব্য : ইবনু জারীর তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, ৫ খ., পৃ. ১৫৯

উসমান ইবনু আফফানের (রা) শাহাদাতের পর কিছু লোক আলী ইবনু আবী তালিবকে (রা) খালীফাহ বানাতে চাইলে তিনি বলেন, "এই কাজ করার ইখতিয়ার তোমাদের নেই। এইটি তো শূরা সদস্য ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজ। তাঁরা যাকে খালীফাহ বানাতে চান তিনিই খালীফাহ হবেন।" দ্রষ্টব্য : আত্-তাবারী, ৩ খ., পৃ. ৪৫০; সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, খিলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃ. ৮১

আল্লামা ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহ) বলেন, "গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করা শারীয়াহর অন্যতম বিধান।" দ্রষ্টব্য : ফাতহুল বারী, ২ খ., পৃ. ২১৯

শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ) বলেন, "পরামর্শ করে কাজ করা আল্লাহ্‌র পছন্দ। দীনের হোক বা দুনিয়ার, রাসূলুল্লাহ (রা) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন, সাহাবীগণও নিজেরা যুদ্ধ ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ করতেন, বরং খিলাফাতে রাশেদার ভিত্তি ছিলো শূরা।"

দ্রষ্টব্য : তাফসীরে উসমানী, পৃ. ৬৪৮

উল্লেখ্য যে, সংগঠনের কিংবা রাষ্ট্রের গোটা জনশক্তির সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই জনশক্তির প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত ফোরামকে বলা হয় মাজলিসুশ শূরা। নেতা যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন মাজলিসুশ শূরার অধিবেশন আহ্বান করবেন। আহূত ব্যক্তিগণ মুক্ত মন নিয়ে অধিবেশনে যোগদান করবেন, আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহকে সামনে রেখে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি অধিকতর যুক্তিপূর্ণ অভিমতের নিকট নিজের অভিমত কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকবেন। নেতা ধৈর্য সহকারে অধিবেশন পরিচালনা করবেন এবং একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা চালাবেন। যদি কিছুতেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না যায়

তাহলে উপস্থিত ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতকে সিদ্ধান্তের ভিত্তি বানিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। আর সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সকলেই সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য অবদান রাখবেন।

ইসলামী সংগঠনের নেতা একাকী কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তাই তাঁর স্বেচ্ছাচারী হওয়ারও কোন সুযোগ নেই। উল্লেখ্য যে, কোন কোন ব্যক্তি বলতে চান যে, ইসলামী সংগঠনের আমীর কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরুল মুমিনীন একাকীও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, মাদীনাহ্‌র বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ উপেক্ষা করেই আমীরুল মুমিনীন আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা) উসামাহ ইবনু যায়িদের (রা) নেতৃত্বে সিরিয়ার দিকে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন।

এই কথাটি প্রকৃত সত্যের বিপরীত। আসল ব্যাপার হচ্ছে ঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) উসামাহ ইবনু যায়িদের (রা) নেতৃত্বে সিরিয়ার দিকে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার খবর শুনে উসামাহ (রা) সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে মাদীনার বাইরে এক স্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করতে থাকেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের খবর শুনে উসামাহ (রা) মাদীনায় ফিরে আসেন। আমীরুল মুমিনীন হওয়ার পর আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) অভিপ্রায় অনুযায়ী উসামাহকে (রা) সসৈন্যে সিরিয়া পাঠান। মূলত এই সিদ্ধান্ত ছিলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা)। আবু বাক্‌র আস্‌-সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছেন মাত্র। কাজেই এই ঘটনাকে অবলম্বন করে ইসলামী সংগঠনের আমীর কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরুল মুমিনীন একাকী কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তা প্রমাণ করতে চাওয়া সঠিক কাজ নয়।

আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের অংশ গ্রহণ।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পৃথকভাবে মহিলাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি একই ফোরামে পুরুষ ও মহিলাদেরকে একত্রিত করে আলোচনা সংঘটিত করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেননি।

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগেও একই কর্মধারা অনুসৃত হয়েছে।

অর্থাৎ মহিলাদের কাছ থেকে পৃথকভাবে পরামর্শ গ্রহণ করাই ছিলো সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ ও সুন্নাতু খুলাফায়ে রাশিদীন।

যোগ্য সংগঠকের পরিচয়

কারো পক্ষে সংগঠক বনে যাওয়া কঠিন কিছু নয়, কিন্তু যোগ্য সংগঠক হওয়া সত্যি কঠিন। সংগঠনের কিছু রুটিন ওয়ার্ক সম্পন্ন করা খুবই সহজ, কিন্তু সংগঠনে প্রাণ-বন্যা সৃষ্টি করা মোটেই সহজ নয়।

সংগঠনে প্রাণ-বন্যা সৃষ্টি করা এবং তা অব্যাহত রাখা একজন যোগ্য সংগঠকের পক্ষেই সম্ভব। বহুমুখী কর্মকান্ডের ভেতর দিয়ে একজন যোগ্য সংগঠক তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে যান। সংগঠনের সর্বত্র প্রাণচাঞ্চল্য এবং গতিশীলতা অব্যাহত রেখে সংগঠনটিকে উত্তরোত্তর অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম সংগঠকই যোগ্য সংগঠক।

একজন যোগ্য সংগঠক একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তাঁর প্রতি কর্মী বাহিনী স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধাবনত থাকে। আর এই শ্রদ্ধা কর্মীদের মনে বিনা কারণেই উৎসারিত হয়না। সংগঠকের উন্নত মানের সততা ও যোগ্যতাই তাঁকে কর্মীদের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করে। কর্মীরা যদি সংগঠককে প্রাণভরে ভালোবাসতে পারে তাহলে তাঁর নির্দেশে তারা যেইকোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাঁর নির্দেশ পালনে তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা বা কুণ্ঠা থাকেনা।

শ্রদ্ধাভাজন সংগঠককে কড়া নির্দেশ দিয়ে কর্মীদেরকে কাজে নামাবার প্রয়াস চালাতে হয়না। তাঁর ইংগিত বা অনুরোধই কর্মীদেরকে কর্মচঞ্চল করার জন্য যথেষ্ট। একজন সংগঠক বিভিন্নমুখী যোগ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে যোগ্য সংগঠকের স্তরে উন্নীত হন। এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে কিছু যোগ্যতার কথা আলোচনা করবো।

১. জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব

একজন সংগঠককে অবশ্যই জ্ঞানীব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন। আদর্শ, আন্দোলন ও সংগঠন সংক্রান্ত যেই কোন প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেবার মতো জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা তাঁর থাকা চাই। বিরোধী মতবাদগুলোর বক্তব্য সম্পর্কেও তাঁকে থাকতে হবে ওয়াকিফহাল। সেইগুলোর ভ্রান্তি ও পূর্ণাংগতা সম্পর্কেও তাঁর অবগতি থাকা প্রয়োজন।

২. উন্নত আমল

একজন আদর্শ সংগঠককে অবশ্যই আদর্শের মূর্ত প্রতীক হতে হবে। আদর্শের দৃষ্টিতে পালনীয় বিষয়গুলোর অনুশীলনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাই হবে তাঁর জীবনের প্রকৃত ভূষণ। তাঁর আমল হতে হবে অন্যদের জন্য অনুকরণযোগ্য।

৩. সুন্দর ব্যবহার

একজন যোগ্য সংগঠকের ব্যবহার অবশ্যই সুন্দর হতে হবে। তিনি কখনো রুক্ষভাষী হবেন না। তাঁর আচরণ রূঢ় হবে না। বরং তাঁর আচরণ কর্মীদেরকে চুম্বকের মতো কাছে টেনে নিয়ে আসার মতো মধুর হওয়া চাই।

৪. অগ্রণী ভূমিকা পালন

সংগঠনের কাজ আগে বাড়িয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অথবা কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের ক্ষেত্রে সংগঠকেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। এইসব বিষয় নিয়ে তিনিই বেশী বেশী ভাববেন, তিনিই নতুন নতুন চিন্তা পেশ করবেন, নতুন নতুন কর্মকৌশল তিনিই উদ্ভাবন করবেন। এইভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব দেবেন। আবার বহির্মুখী কর্মকাণ্ডেও তিনিই ইনিশিয়েটিভ গ্রহণ করবেন। মোট কথা, চিন্তা ও কাজ-উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর ভূমিকা হবে অগ্রণী ভূমিকা।

৫. সাহসী ভূমিকা পালন

যেই সংগঠন সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী সেই সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীগোষ্ঠী ভালো চোখে দেখবে- এটা স্বাভাবিক নয়। প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে যারা যুলুম ও শোষণ চালায় তারা যে এই সংগঠনের অগ্রগতি দেখে আঁতকে ওঠে শুধু তাই নয়, বরং এই সংগঠনের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেবার জন্য নানা ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর সওয়ার হয়ে বহুবিধ নির্যাতন ও নিপীড়ন চালায়। ফলে সংগঠন নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এই ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিতে সংগঠককে শক্তভাবে সংগঠনের হাল ধরে থাকতে হয়। একজন যোগ্য সংগঠকের চেহারা ও কর্মকান্ডে এমন পরিস্থিতিতেও ভীতির চিহ্ন ফুটে ওঠবে না। তাঁর এই সাহসী ভূমিকাই কর্মীদেরকে সাহসী করে তুলবে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলা করে সামনে এগুবার হিম্মত যোগাবে।

৬. সঠিক মানের কর্মী গঠন

সংগঠনের সঠিকমানের কর্মী তো তারাই যারা এর আদর্শ ও আন্দোলনকে সঠিকভাবে বুঝেছে, সংগঠনের লক্ষ্য ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে, এর কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি বুঝেশুনে গ্রহণ করেছে, এর নির্বাচন পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, সমালোচনা পদ্ধতি, কর্মী গঠন পদ্ধতি ইত্যাদি ভালো ভাবে বুঝেছে এবং শুধু জানা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থেকে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী বাস্তব ময়দানে ভূমিকাও পালন করে চলছে।

এই মানে কর্মীদের গড়ে তোলার জন্য সংগঠক সাংগঠনিক প্রক্রিয়া গুলোর ওপর তো নির্ভর করবেনই, তদুপরি তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে এই বিষয়ের দিকে

কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও আলাপের মাধ্যমে জ্ঞানের মান ও কর্মতৎপরতার মান ভালোভাবে আঁচ করে পরামর্শ দেবেন। এইভাবে কর্মীদের সঠিক মানে উন্নীত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে হয় সংগঠককে।

৭. সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ

কোন সংগঠনের পরিকল্পনা তৈরী হয় সেই সংগঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য। অর্থাৎ পরিকল্পনার ভিত্তি হচ্ছে সংগঠনের স্থায়ী কর্মসূচী। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব সংগঠককেই পালন করতে হয়। তার পর সেটি সংশ্লিষ্ট ফোরামে পেশ করতে হয় অনুমোদনের জন্য।

পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কর্মী সংখ্যা, কর্মীদের মান, সংগঠনের আর্থিক সংগতি, শুভাকাংখীদের আর্থিক সহযোগিতার সম্ভাবনা, সংগঠনের প্রভাব বলয়, পরিবেশ-পরিস্থিতি, বৈরী শক্তিগুলোর শক্তি ও কর্মকৌশল, সামগ্রিকভাবে সমাজ পরিবেশ, সংগঠনের তৎপরতার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, সংগঠনের কর্মধারা নির্ধারণে বর্তমান সময়ের দাবী ইত্যাদি সামনে রাখতে হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন কালে এই বিষয়গুলো সামনে না রাখলে পরিকল্পনা একপেশে হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। আর সবগুলো দিক বিবেচনা করে পরিকল্পনা রচিত হলে তা বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। একটি বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়নের যোগ্যতা একজন সংগঠকের খুবই বড়ো একটি যোগ্যতা।

৮. জরুরী পরিস্থিতিতে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সংগঠনের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় অশান্ত ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতি সংগঠনের স্বাভাবিক গতিধারা দারুণভাবে প্রভাবিত করে। আবার এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যা সংগঠনের জন্য বিপজ্জনক। এই ধরনের পরিস্থিতি স্থায়ী কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা দ্বারা মুকাবিলা করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই সংগঠককে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে সংগঠকের কর্তব্য হচ্ছে, উদ্ভুত পরিস্থিতির ত্বরিৎ মূল্যায়নের পর ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জনশক্তিকে তা যথাশীঘ্র জানিয়ে দেয়া। জরুরী পরিস্থিতিতে অবিলম্বে করণীয় নির্ধারণ করার যোগ্যতাও সংগঠকের অতি বড়ো একটি যোগ্যতা।

৯. পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

কোন বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ লোক ব্যাপক আলোচনার পর কোন সিদ্ধান্ত নিলে

সংগঠনের অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে তাদের সামনেও এই বৈশিষ্টগুলোর গুরুত্ব সঠিকভাবে তুলেধরা এবং তাদেরকে এইগুলোর নিশানবরদার রূপে গড়ে তোলা সংগঠকের অন্যতম কর্তব্য।

১৭. আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

একটি সংগঠনের থাকে নানামুখী কাজ। এইসব কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। সংগঠনের জনশক্তিকে অধিক পরিমাণে আর্থিক কুরবানী করতে উদ্বুদ্ধ করবেন সংগঠক। শুধু সংগঠনের কর্মীদের অর্থদানের ওপর নির্ভর না করে শুভাকাংখীদের কাছে বিভিন্ন কাজের প্রকল্পপেশ করে তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সংগঠকেরই কাজ। সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিদের সাথে সংগঠকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। সংগঠনের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে একজন আদর্শ সংগঠক ব্যক্তিগতভাবেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

১৮. শৃংখলা সংরক্ষণ

শক্তিশালী সংগঠন মানেই সুশৃংখল সংগঠন। আর শৃংখলার মূল উৎপাদন হচ্ছে আনুগত্য। আনুগত্য সম্পর্কে আলকুরআন এবং আলহাদীস যেই সব পথ নির্দেশ পেশ করেছে সেইগুলো সম্পর্কে কর্মী বাহিনীকে ওয়াকিফহাল করে তোলা এবং এই বিষয়ে কর্মীদেরকে সদাজাগ্রত রাখা সংগঠকেরই কাজ।

আনুগত্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদেয়ার জন্যই সংগঠনে থাকে গঠনতন্ত্র বা সংবিধান। গঠনতন্ত্র সঠিকভাবে মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন কর্মীর শৈথিল্য প্রকাশ পেলে অবিলম্বে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে এবং তাকে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। পর্যাপ্ত প্রচেষ্টার পরও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংশোধিত না হলে তার বিরুদ্ধে সাংবিধানিক শাস্তি মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

গঠনতন্ত্রের আনুগত্য করেনা এমন ব্যক্তির প্রতি নমনীয় আচরণ করা হলে আনুগত্যহীনতাকেই উৎসাহিত করা হবে। এতে করে আনুগত্যহীনতার ব্যাধি সংক্রমিত হয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করার আশংকা রয়েছে। তাতে সংগঠনের শৃংখলা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। তাই সংশোধনের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোর পর সংগঠনের স্বার্থেই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে একজন যোগ্য সংগঠক কুণ্ঠিত হবেন না।

১৯. কর্মীদের বিভিন্নমুখী প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ

সংগঠনের কর্মীরা একধরনের কাঁচামাল। এদের মাঝে সুপ্ত থাকে অনেক সম্ভাবনা। কর্মীদেরকে ভালো সংগঠক, ভালো লিখক, ভালো বক্তা, ভালো

সমাজকর্মী এবং ভালো জননেতা রূপে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। তাছাড়া বিভিন্ন টেকনিকেল প্রশিক্ষণও যেমন, টাইপরাইটিং, শর্টহ্যান্ড, মোটরড্রাইভিং ইত্যাদি তাদেরকে দেবার সুযোগ করে দেয়া প্রয়োজন। আধুনিক সমাজের এই ধরনের টেকনিকেল প্রশিক্ষণ কর্মীদেরকে ব্যাপকতর দক্ষতার অধিকারী করে তোলে। কর্মীদের নানামুখী প্রতিভাবিকাশের কর্মকৌশল উদ্ভাবন করা সংগঠকেরই কাজ।

২০. সুদূর প্রসারী চিন্তা নিয়ে প্রতিভাবান কর্মীদের ব্যবহার

প্রতিভাবান কর্মীরা সংগঠনের নিকট আল্লাহর এক অতি মূল্যবান আমানত। এদের সঠিক ব্যবহার আমানতদারীরই দাবী। এদের সঠিক ব্যবহার না হওয়া আমানতদারীর খেলাফ কাজ।

সংগঠক ভালোভাবে কর্মীদের ষ্টাডি করবেন। কারা ময়দানের কাজে বেশী উপযুক্ত হবে তা বুঝে তাদেরকে চিহ্নিত করবেন। একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার জন্য উন্নতমানের রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, প্রশাসক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, আইনবিদ, সাহিত্যিক, কূটনীতিবিদ, বিজ্ঞানী ইত্যাদি প্রয়োজন। একজন সংগঠককে বুঝতে হবে তাঁর কর্মী বাহিনীর প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কে কোন ময়দানের জন্য বেশী উপযুক্ত। যারা যেই ময়দানের উপযুক্ত তাদেরকে সেই ময়দানে বিশেষজ্ঞ হবার সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। একজন বিজ্ঞ সংগঠকই কেবল এই লক্ষ্যে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

২১. কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করে দ্রুত অগ্রসরমান কর্মীদের বাছাই করণ

আপন দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে পরিকল্পনার আলোকে ময়দানে কাজ করতে থাকলেও কর্মীদের সকলের কাজের মান এক হয় না। দেখা যাবে কোন কোন কর্মী যেনতেন ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। আবার কোন কোন কর্মী কাজ করছে খুবই সুন্দর ভাবে।

সুন্দরভাবে যারা কাজ করছে তাদের মাঝেও দু'ধরনের কর্মী দেখা যায়। এদের একাংশ কাজটা তো সুন্দরভাবে করছে, তবে সময় নিচ্ছে বেশী। অপরাংশ কাজটা সুন্দরভাবে করতে গিয়েও বেশী সময় নিচ্ছেনা। বুঝতে হবে, এরা অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি। এদের দ্বারা বেশী পরিমাণে কাজ করিয়ে নেয়া সম্ভব।

কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করলে আরো দেখা যাবে যে কর্মীদের অনেকেই ভালো কর্মী বটে, তবে নেতৃত্বদানের যোগ্যতা তাদের নেই। আবার অনেকেই এমন আছে যারা নিজেও ভালোভাবে কাজ সম্পাদন করে, তদুপরি অন্যকে দিয়েও কাজ করিয়ে নেয়ার যোগ্যতা রাখে। বুঝতে হবে, নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা এদের মাঝে রয়েছে।

যোগ্য সংগঠকের কাজ হচ্ছে কর্মীদের মধ্য থেকে যাদের সমঝ শক্তি ও কর্মশক্তি বেশী তাদেরকে আলাদা তালিকা ভুক্ত করে নেয়া।

২২. বাছাই করা কর্মীদের ব্যাপকতর প্রশিক্ষণ

সম্ভাবনাময় কর্মীদের তালিকা তৈরী করাই যথেষ্ট নয়। এদের জন্য ব্যাপকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আদর্শ, আন্দোলন ও সংগঠনের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও তাদেরকে ওয়াকিফহাল করে তুলতে হবে। আদর্শ, আন্দোলন ও সংগঠনের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা তাদের মাঝে বিকশিত করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম দিতে পারেন একজন দূর দৃষ্টি সম্পন্ন সংগঠক।

২৩. পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি

কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে না উঠলে কোন সংগঠনকে শক্তিধর সংগঠন বলা চলেনা। ইসলামী সংগঠনের কর্মীদেরকে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো মজবুত হতে হবে, এটাই আল্লাহর দাবী। এর অর্থ হচ্ছে, এই সংগঠনের কর্মীগণ একে অপরের প্রতি গভীর মমত্ববোধ অনুভব করবে, একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করবে।

এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কর্মীদের মাঝে এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভংগির বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। একে অপরের ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখা, একে অপরের দোষের চেয়ে গুণের দিকে বেশী তাকানো, কোন অবস্থাতেই একে অপরের প্রতি রুষ্ট না হওয়া এবং একে অপরের গীবাত না করা- পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলার বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হয় সংগঠককেই।

২৪. নিষ্ক্রিয়তার প্রতিকার

কোন কারণে মনে খটকা সৃষ্টি হওয়া, কারো আচরণে রুষ্ট হওয়া, কোন প্রপাগ্যান্ডায় প্রভাবিত হওয়া,পরিস্থিতির ভয়াবহতায় ভীত হওয়া, কোন অবাঞ্ছিত ঘটনায় ব্যথিত হওয়া, নিজের জীবনে কোন অপরাধ ঘটে যাওয়া, ব্যক্তিগত জীবনে কোন বড়ো রকমের সমস্যা সৃষ্টি হওয়া-এই ধরনের কোন কারণে একজন কর্মী নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। সংগঠক কোন কর্মীর এমন অবস্থার কথা জানতে পেলেই শিগগির তার সাথে দেখা ও আলাপ করে আসল কারণটি চিহ্নিত করবেন এবং আলকুরআন ও আলহাদীসের আলোকে বক্তব্য রেখে তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাবেন।

২৫. স্থবিরতার প্রতিরোধ

সংগঠনের কোন স্তরে স্থবিরতা আসতে পারে নানা কারণে।

সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণে সংগঠকের অপারগতা, কর্মী সভাগুলোতে প্রাণবন্ত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পরিবেশিত না হওয়া, দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের রূঢ় আচরণ, দুশমনদের পরিচালিত উৎপীড়নে ধৈর্যচ্যুতি-এই ধরনের নানা কারণে একই সময় বেশীসংখ্যক কর্মী কর্মোদ্যম হারিয়ে ফেললে সংগঠন বা সংগঠনের অংশ বিশেষ স্থবিরতার শিকার হয়। এতে করে সংগঠন বেঁচে থাকলেও অগ্রগতি থেমে যায়।

সংগঠনে এমন কোন অবস্থার সূত্রপাত হচ্ছে কিনা যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে স্থবিরতা সেই সম্পর্কে সংগঠককে সদা সচেতন থাকতে হবে। এই ধরনের কোন কিছুর লক্ষণ প্রকাশ পেলেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সংগঠনের যাবতীয় অনুষ্ঠান এবং বক্তব্য যাতে আকর্ষণীয় হয় তা নিশ্চিত করা যোগ্য সংগঠকেরই কাজ।

২৬. বিভিন্ন কাজের ভারসাম্য সংরক্ষণ

সংগঠনের আদর্শিক কনসেপ্টগুলো সাধারণের কাছে ছড়িয়ে দেবার কাজ, সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটানোর কাজ, জনশক্তির মানোন্নয়নের কাজ, সমাজ সেবা ও সংস্কার মূলক কাজ, সংগঠনের গণ ভিত্তি রচনার কাজ, জনগণের নেতৃত্ব দানের কাজ- এই ধরনের বহুমুখীকাজ একটি সংগঠনকে আঞ্জাম দিতে হয়। এই কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য পুরো জন শক্তিকে মাঠে ময়দানে নিয়োজিত করতে হয়। সংগঠক লক্ষ্য রাখবেন যাতে এক প্রকারের কাজের আধিক্য অপরাপর কাজগুলোকে গুরুত্বহীন না করে ফেলে। কোন এক সময় কোন এক ধরনের কাজ বেশী গুরুত্ব পেয়ে যাওয়াতে অপর কোন একটি কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে দেখলে পরবর্তী সময়ে সেই কাজটির ওপর বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। সামগ্রিক ভাবে কাজের ভারসাম্য রক্ষা করা একজন সুযোগ্য সংগঠকের পক্ষেই সম্ভব।

২৭. আমানত সংরক্ষণ

একটি সংগঠনের থাকে তহবিল। থাকে অনেক আসবাব-পত্র, অফিস ভবন ইত্যাদি। এই গুলো সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগঠকের কাছে গচ্ছিত থাকে। এই গুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সঠিক ব্যয়-ব্যবহারেরই নাম আমানতদারী। সংগঠক কোন অবস্থাতেই সংগঠনের অর্থ ও সম্পদ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করে ফেলবেন না। সংগঠনের অর্থ বা সম্পদ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয়-ব্যবহার করলে একজন সংগঠক কিছুতেই কর্মীদের শ্রদ্ধাভাজন থাকতে পারেন না।

একজন যোগ্য সংগঠক আমানত সংরক্ষণে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভূমিকা পালন করে থাকেন।

২৮. সঠিক ভাবে রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ

একটি সংগঠনের অনেক জরুরী কাগজপত্র, ফাইল ও রেজিষ্টার থাকে। এইগুলোকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা খুবই জরুরী। প্রত্যেকটি বিষয় সংক্রান্ত স্বতন্ত্র ফাইল, প্রত্যেকটি ফাইলে নির্দিষ্ট নাম্বার এবং ফাইলগুলোর একটি ইনডেক্স্ থাকা প্রয়োজন।

ফাইলগুলো নির্দিষ্ট এবং নিরাপদ স্থানে সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউ এইগুলো নাড়াচাড়া না করতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রতিটি কাগজ সঠিক ফাইলে যায়, অন্য ফাইলে নয়।

এইভাবে ফাইল মেনটেন করা হলে কাগজপত্র সঠিকভাবে হিফাজাত হয়। আর প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র বিনা মেহনতে এবং সময় খরচ না করে বের করা সম্ভব হয়। সুবিন্যস্তভাবে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করাটাও একজন সুযোগ্য সংগঠকের অন্যতম বিশেষ গুণ।

২৯. সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ

সংগঠনের প্রয়োজনে সংগঠকই প্রধানতঃ অর্থ ব্যয় করে থাকেন। ক্যাশিয়ার বা বাইতুলমাল বিভাগের সচিব তহবিল সংরক্ষণ করে। সে নিজের সিদ্ধান্তে তহবিলের অর্থ ব্যয় করার অধিকারী নয়। অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ আসবে সংগঠকের কাছ থেকে। সেই নির্দেশ লিখিত ভাবে আসাই উত্তম। সেই নির্দেশ মুতাবিক ক্যাশিয়ার তার কাস্টোডি থেকে অর্থ হস্তান্তর করবে লিখিত ভাউচারের বিনিময়ে। সংগঠনের তহবিলে কোন অর্থ আসবে না রসিদে এন্ট্রি না হয়ে। তেমনি ভাউচার ছাড়া কোন অর্থ ব্যয় হবে না। ক্যাশিয়ার অর্থ ব্যয়ের একটি টালি সংরক্ষণ করবে। আর একাউনট্যান্ট ক্যাশবই, লেজার বই এবং ষ্টেটমেন্ট অব একাউন্টস ক্রমাগতভাবে লিখে যেতে থাকবে আধুনিক হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির চাহিদা পূরণ করে। একই ব্যক্তি অর্থ আদায় করা, অর্থ ব্যয় করা এবং আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা মোটেই বিজ্ঞান সম্মত নয়। এতে হিসাব সংরক্ষণে গোলমাল দেখা দিতে বাধ্য।

একজন বিজ্ঞ সংগঠক কিছুতেই এই গোলমালে পড়ে নিজের ইমেজ বিনষ্ট করতে তৈরী হতে পারেন না। তাই তাঁকে দেখা যাবে এইক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

৩০. বৈরী শক্তিগুলোর মুকাবিলার জন্য বিজ্ঞান সম্মত পন্থা উদ্ভাবন

বৈরী সংগঠনগুলো ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের চরিত্রহনন এবং সংগঠন

সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে থাকে।

এই প্রচারণা যে মিথ্যাশ্রয়ী তা সঠিকভাবে জনগণকে জানিয়ে দেয়ার পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে সংগঠককে। ইতিহাস সাক্ষী, বৈরী শক্তিগুলো যখন দেখে যে তাদের মিথ্যা প্রচারণাও শেষ রক্ষা করতে পারছেনা তখন তারা ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের ওপর দৈহিক হামলা চালাতে শুরু করে।

এমতাবস্থায় সঠিক কর্ম কৌশল উদ্ভাবন করা সংগঠকেরই দায়িত্ব।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সাধারনতঃ যুলম বিরোধী। সেই কারণে মাযলুমের প্রতি তাঁরা থাকে সহানুভূতিশীল। যালিমদেরকে চিহ্নিত করে তাদের ঘৃণ্য তৎপরতা উন্মুক্ত করে পেশ করতে হবে জনগণের কাছে। যালিমদের যুলমের কাহিনী বা বিবরণ সঠিক ভাবে জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারলে বিবেকবান জনগণ তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হবে। এইভাবে যালিমগণ হবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। মনে রাখা দরকার যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন যালিমদের সন্ত্রাসী তৎপরতা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। জনগণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে শেষাবধি তা ভন্ডুল হয়ে যায়।

কি কি পন্থায় যালিমদেরকে এক্সপোজ করে জনগণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা অর্জন করা যায় তা নির্ণয় করে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করা একজন যোগ্য সংগঠকের কাজ।

৩১. গণ-ভিত্তি রচনা

যেহেতু এইযুগে দুনিয়ায় সামগ্রিকভাবে ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারাই প্রায় সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, সেহেতু দুনিয়ার কোন অঞ্চলে ইসলামী বিপ্লব ঘটাতে হলে, সেই ভূ-খন্ডের জনগণের নীরব সমর্থন যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন তাদের সক্রিয় সমর্থনের।

কোন ভূ-খন্ডের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তখনই ইসলামী সংগঠনের সক্রিয় সমর্থকে পরিণত হতে পারে যখন তারা উপলব্ধি করবে যে এই সংগঠন যা বলছে তা তাদের মনেরই কথা, এই সংগঠন যা করতে চায় তা করা গেলে তাদেরই কল্যাণ হবে এবং এই সংগঠনের দেখানো পথই সমস্যা সমাধানের একমাত্র নির্ভুল পথ।

এই উপলব্ধির পরও জনগণ সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য এগিয়ে আসবে না, এটা স্বাভাবিক নয়। নিজেদের মংগলের পথ নির্ভুল ভাবে চিনতে পারার পরও তারা এই পথের পথিকদেরকে আপন ভাববে না বা তাদের সাথে একাত্ম হবে না, এটা হতে পারে না। এমতাবস্থায় তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই সংগঠনের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াবে।

এমন একটি অবস্থা সৃষ্টির নামই গণভিত্তি রচনা। কিভাবে এই অবস্থা সৃষ্টি করা যায় তা নির্ণয় ও কার্যকর করা যোগ্য সংগঠকেরই কাজ।

৩২. অধঃস্তন ব্যক্তি ও অধঃস্তন সংগঠন থেকে কাজের রিপোর্ট আদায়

অধঃস্তন ব্যক্তি ও অধঃস্তন সংগঠনের ওপর অর্পিত স্থায়ী বা কোন সাময়িক কাজের রিপোর্ট আদায় করবেন সংগঠক। তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংগঠনের কাজের রিপোর্ট তাঁর হাতে এলো কিনা। যদি কোথাও থেকে সঠিক সময়ে রিপোর্ট এসে পৌঁছে না থাকে তাহলে সংগে সংগে রিমাইন্ডার দিতে হবে। প্রথম রিমাইন্ডারের পর রিপোর্ট না এলে আবারো রিমাইন্ডার দিতে হবে। অর্থাৎ রিপোর্ট তাঁকে আদায় করতেই হবে।

৩৩. রিপোর্টের আলোকে কাজের পর্যালোচনা

অধঃস্তন সংগঠন থেকে রিপোর্ট আদায় তখনই অর্থবহ হতে পারে যখন সংগঠক আদায়কৃত রিপোর্ট পড়বেন, কাজের অগ্রগতি বা অধোগতি নির্ণয় করবেন এবং সেই মুতাবিক অধঃস্তন সংগঠনকে লিখিত পর্যালোচনা ও পরামর্শ পাঠাবেন।

নিয়মিত ভাবে কাজের এরূপ মূল্যায়ন হতে থাকলে অধঃস্তন সংগঠন উপকৃত হয় এবং সহজেই পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ এইভাবে রিপোর্ট পর্যালোচনার মাধ্যমে সংগঠক অধঃস্তন ব্যক্তি বা সংগঠনের কাজ উন্নততর করার ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন।

৩৪. কুণ্ঠাহীন জবাবদিহি

জবাবদিহি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যিনি কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য নিযুক্ত হন, তাঁকে নিয়োগকারী ব্যক্তিদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। দুনিয়ার সর্বত্রই এই নিয়ম প্রচলিত রয়েছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কতিপয় কর্তব্য পালনের জন্য প্রেরণ করেছেন। এই কর্তব্য পালন সম্পর্কে তিনি এক নির্দিষ্ট দিনে সকল মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন বলেও জানিয়েছেন। অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃত কর্মের জন্য আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে।

কোন সংগঠনের সংগঠক নিরংকুশ স্বাধীন কোন ব্যক্তিত্ব নন। যারা তাঁকে নির্বাচিত বা নিযুক্ত করেছে তিনি তাদের প্রশ্নের জবাবদান এবং তাঁর দায়িত্ব পালন ও অর্থ-সম্পদ ব্যয়-ব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। একজন আদর্শ সংগঠক কুণ্ঠাহীন ভাবেই এই জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকেন।

৩৫. যোগ্য উত্তরসূরী সৃষ্টি

আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান সংগঠক। কিন্তু কোন সংগঠকই অমর নন। তদুপরি জীবদ্দশাতেও একজন সংগঠকের স্থানান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাঁর স্থানান্তরিত হওয়া অথবা ইনতিকালের পর যদি শূন্য স্থান পূর্ণ করার মতো যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া না যায় তা সংগঠনের জন্য মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে। সংগঠন যাতে এই ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন না হয় তার জন্য সংগঠককে পূর্বাহ্নেই পরিকল্পিতভাবে বিকল্প নেতৃত্বের একটি গ্রুপ তৈরী করতে হয়। এইক্ষেত্রে বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (সা) তো অনন্য উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন। তিনি নেতৃত্ব দেবার মতো যোগ্য বেশ কয়েকজন ব্যক্তি গড়ে তুলেছিলেন যাঁরা তাঁর ইনতিকালের পর একের পর এক সফলভাবে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব প্রদান করেছেন।

নিঃসন্দেহে যোগ্য উত্তরসূরী সৃষ্টি একজন সংগঠকের অতি বড়ো একটি কৃতিত্ব।

কর্মীদের প্রতি নেতৃত্বের আচরণ

নেতৃত্ব এবং কর্মীদের মিলিত প্রয়াসের ওপর ভিত্তি করেই আন্দোলনের কাজ সামনে এগুতে থাকে। নেতৃত্ব এবং কর্মীদের মাঝে সুসম্পর্ক থাকলে কাজ স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে অগ্রসর হয়। এই সম্পর্ক কাংখিত মানে না থাকলে কাজের গতি স্বচ্ছন্দ থাকে না বরং মাঝেমধ্যেই এর গতি ব্যাহত হয়। এইভাবে হোঁচট খেতে খেতে এক পর্যায়ে এসে কাজের গতি একেবারে মন্থর হয়ে পড়ে।

কাজের সুন্দর ও স্বাভাবিক অগ্রগতির জন্য নেতৃত্ব এবং কর্মীদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর এই সুসম্পর্ক নির্ভর করে একের প্রতি অপরের বাঞ্ছিত আচরণের ওপর। এই নিবন্ধে আমরা কর্মীদের প্রতি নেতৃত্বের কাংখিত আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. নেতৃত্ব হবেন কর্মীদের জন্য প্রেরণার উৎস

একটি আদর্শিক আন্দোলনের কর্মীদেরকে নানামুখী কাজ-কর্ম করতে হয়। এইসব কাজ যেমনি দাবী করে সময়, তেমনি পরিশ্রম।

আবার আদর্শিক আন্দোলনের পথ মোটেই ফুলবিছানো নয়। এই পথে আছে নানা বাধা-বিপত্তি। তদুপরি কর্মীদের অনেকেরই বড়ো বড়ো ব্যক্তিগত সমস্যা থাকে যা তাদেরকে হতোদ্যম করে ফেলতে পারে।

যাবতীয় কাঠিন্য বরদাশত এবং সমস্যা ও বাধা উপেক্ষা করে আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাবার মন-মানসিকতা সজীব রাখার জন্য নেতৃত্বকে ভূমিকা পালন করতে হয়। আদর্শিক জ্ঞান বিতরণ, সদালাপ, অমায়িক ব্যবহার এবং উন্নত চরিত্রের প্রভাব দ্বারাই কেবল নেতৃত্ব এই ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারেন।

২. নেতৃত্ব বিনম্র ভাষায় নির্দেশ দেবেন

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের ওপর নেতৃত্বের নির্দেশ পালনকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। আল্লাহর এই বিধান সম্পর্কে অবহিত প্রত্যেক কর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নেতৃত্বের নির্দেশ পালন করবেন, এটাই স্বাভাবিক।

নেতৃত্ব কর্মীদেরকে বিভিন্ন কাজের নির্দেশ অবশ্যই দেবেন। তবে নির্দেশ প্রদানের ভাব-ভংগি ও ভাষা মোটেই রুক্ষ হওয়া উচিত নয়। কোন অবস্থাতেই ভদ্রতার সীমারেখা লংঘন করা উচিত নয়। নেতৃত্ব কোন একটি কাজ সম্পন্ন হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরবেন। প্রয়োজনে নেতৃত্ব বার বার কাজ বা বিষয়টির দিকে

কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তিনি বা তাঁরা বলিষ্ঠভাবে তাঁর বা তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরবেন। কিন্তু নেতৃত্বকে সজাগ থাকতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই মেজাজ উগ্র না হয়ে পড়ে।

৩. নেতৃত্ব কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবেন

একটি সংগঠনের কর্মীগণ ম্যাশিন নয়, মানুষ। তাদের রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। পরিবার, প্রতিবেশ বা সমাজ পরিমন্ডলে তাদের সমস্যা থাকতে পারে। কেউ কেউ মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত থাকতে পারে। কেউ কেউ চরম দারিদ্রের শিকার হতে পারে।

এইসব সমস্যা কর্মীদেরকে অহর্নিশ যাতনা দিয়ে থাকে। পীড়ন করতে থাকে তাদেরকে নিদারুণভাবে। ফলে তাদের মানসিক সুস্থিরতা বিনষ্ট হয়। ব্যাহত হয় মনোযোগ। নষ্ট হয় কর্মস্পৃহা। কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের অবগতি থাকা চাই। এক স্তরের নেতৃত্ব সকল স্তরের কর্মীদের সমস্যা সমানভাবে অবহিত থাকবেন, এটা স্বাভাবিক নয়। তবে সামগ্রিকভাবে সংগঠনের সকল কর্মীই যাতে সংগঠনের কোন না কোন পর্যায়ের নেতৃত্বের কাছে তাদের সমস্যাদি ব্যক্ত করতে পারে এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরামর্শ লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা চাই

কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকলে নেতৃত্ব কর্ম বন্টনের সময় ভুল করে ফেলতে পারেন। তিনি কঠিন সমস্যা পীড়িত কোন ব্যাক্তর ওপর তার সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারেন যা কিছুতেই হওয়া উচিত নয়।

৪. নেতৃত্ব বয়স, সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষার মান, ইত্যাদি বিচার করে কর্মীদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

একটি সংগঠনে থাকে নানান কাজ। কোন কাজ উচ্চ শিক্ষা দাবী করে, কোনটি তা করে না। কোন কাজ খুব দৈহিক শ্রম দাবী করে, কোনটি তা করে না। কোন কাজ দীর্ঘ সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা দাবী করে, কোনটি তা করে না।

তাই কর্ম বন্টনের সময় কর্মীদের বয়স, সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষার মান ইত্যাদি বিচার করে যেই ব্যক্তি যেই কাজের উপযুক্ত তার ওপর সেই কাজ অর্পণ করতে হবে। এইভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে কর্মবন্টন করলে দেখা যাবে সঠিক ব্যক্তির ওপর সঠিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

৫. নেতৃত্ব কর্মীদের কার্য সম্পাদনে সহযোগিতা করবেন

কোন কর্মীর ওপর একটি দায়িত্ব অর্পণ করেই নেতৃত্ব নির্লিপ্ত থাকবেন না। নেতৃত্ব কর্মীকে কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সহযোগিতা প্রদান করবেন।

প্রথমেই কর্মীর ওপর অর্পিত দায়িত্বের দাবীটা কি তা তাকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সেই সম্পর্কেও তাকে পরামর্শ দেয়া যায়। আপন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোন কর্মী কোন জটিলতার সম্মুখীন হলে তা অতিক্রম করার উপায় বলে দিয়েও তাকে সাহায্য করা যেতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে সাময়িকভাবে কোন কর্মীকে প্রথমোক্ত কোন কর্মীর সহযোগিতার জন্য নিয়োজিত করা যেতে পারে।

৬. নেতৃত্ব কর্মীদের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলাপ করবেন

একটি সংগঠনের থাকে নানা ধরনের ফর্মাল মিটিং। এই মিটিংগুলোতে কর্মীদের সাথে নেতৃত্বের সাক্ষাত হয় বটে, কিন্তু অন্তরংগ আলাপের কোন সুযোগ থাকে না। এই মিটিংগুলোর সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকে। এর ভিত্তিতেই মিটিং শুরু হয়, কার্যক্রম সামনে অগ্রসর হয় এবং এক পর্যায়ে এসে মিটিং সমাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় মিটিংয়ে কর্মীদের সাথে নেতৃত্বের সাক্ষাত ঘটলেও তাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার সুযোগ মেলে না। অথচ কর্মীদের মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ, তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তাঁদের মানোন্নয়নের জন্য তাঁদের সাথে নেতৃত্বের ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা খুবই জরুরী। তাই নেতৃত্বকে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাতকারের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করতে হবে।

৭. নেতৃত্ব-কর্মীদের প্রতি কোমলতা-উদারতা-ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করবেন

কর্মীগণ সংগঠনের লক্ষ্য হাসিলেন জন্য আন্তরিকভাবেই প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। অবশ্য কারো মনে যদি কোন কারণে বক্রতা সৃষ্টি হয়ে থাকে ভিন্ন কথা। কর্তব্য পালনের মান সকলের একই রকম হয় না। যোগ্যতা অনুসারে এর তারতম্য হবেই।

তাছাড়া কার্যসম্পাদনকালে কারো কারো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাবেই। নেতৃত্বের কর্তব্য হচ্ছে কর্মীদের সেইসব ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। ভুল মুক্ত হয়ে কাজ করার জন্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কাজের মান উন্নত করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

আচরণের ক্ষেত্রেও সকল কর্মী একই মানের হবার কথা নয়। কারো আচরণ খুবই সুন্দর। আবার কারো আচরণে অনাকাংখিত কিছু প্রকাশ পেতে পারে। অনাকাংখিত কিছু ঘটলে তা শুধরাবার প্রয়াস চালাতে হবে। বার বার সেইদিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

কোন কোন কর্মী কোন এক সময় শৃংখলাবিরোধী আচরণও করে ফেলতে পারে। সেইক্ষেত্রে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। তাদের বিবেককে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস চালাতে হবে। তারা যদি ভুল স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এমন অবাঞ্ছিত আচরণ করবে না বলে অংগীকার করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে হবে। অবশ্য ভুল স্বীকারের পরিবর্তে তারা যদি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে থাকে তাহলে নেতৃত্বকে শৃংখলার স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সংগঠনের সুস্থতার জন্য এই ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই পদক্ষেপকে অবশ্যই ব্যতিক্রম গণ্য করতে হবে। সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব কর্মীদের প্রতি কোমল আচরণ করবেন, তাদের প্রতি উদার হবেন এবং যত বেশী সম্ভব তাদেরকে ক্ষমাশীলতার দৃষ্টিতে দেখবেন, এটাই ইসলামের দাবী।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই ইসলামী আন্দোলনের মূল নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি নম্র ব্যবহার কর।" -আশ্ শূয়ারা।। ২১৫

মহান আল্লাহ্ বলেন, "নম্রতা ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, মা'রুফ কাজের উপদেশ দিতে থাক এবং মুর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না।" - আল আ'রাফ।। ১৯৯ আল্লাহ্ আরো বলেন, "যেই ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করলো এবং ক্ষমা করলো-নিশ্চয়ই তা উচ্চ মানের সাহসী কাজের অন্যতম।"- আশশূরা।। ৪৩

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার ওপর ওহী পাঠিয়েছেনঃ তোমরা পরস্পর বিনয়-নম্রতার আচরণ কর যেই পর্যন্ত না কেও কারো ওপর গৌরব করে ও অপরের ওপর বাড়াবাড়ি করে।"-সহীহ্ মুসলিম

আল্লাহর রাসূল অন্যত্র বলেন, "দান দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ সম্মান বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই করেন না। আর যেই ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" -সহীহ্ মুসলিম

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতা ভাল বাসেন। তিনি কোমলতা দ্বারা ঐ জিনিস দান করেন যা কঠোরতা দ্বারা দেন না। কোমলতা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারাই তিনি তা দেন না।" -সহীহ্ মুসলিম

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন," যেই জিনিসে কোমলতা থাকে কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে। আর যেই জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেয়া হয় সেটা ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়।" -সহীহ্ মুসলিম

আল্লাহর রাসূল (সা) অন্যত্র বলেছেন,"যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে

তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে।" -সহীহ মুসলিম

আল্লাহর রাসূল (সা) আরো বলেন,"জাহান্নামের আগুন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম যে লোকদের সাথে থাকে, যে কোমল মন, নরম মিজাজ ও বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট।" -জামিউত্ তিরমিযী

ক্ষমাশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মহান আল্লাহ্ বলেন, "তাদের বৈশিষ্টঃ তারা রাগ হজমকারী এবং লোকদের প্রতি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বনকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের ভালোবাসেন।" -আলে ইমরান।। ১৩৪

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, "নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল ঐ ব্যক্তি যে অধীন লোকদের প্রতি কঠোর। তোমরা সতর্ক থাকবে যাতে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়।" - সহীহ্ মুসলিম, সহীহুল বুখারী

ইসলামী আন্দোলনের মূলনেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন কোমলতা, উদারতা ও ক্ষমাশীলতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর এই গুণ-বৈশিষ্ট সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন তিনি ". . . . মুমিনদের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" -আত্তাওবাহ।।

"এটা আল্লাহর বড়োই অনুগ্রহ যে তুমি তাদের জন্য নম্র স্বভাবের লোক হয়েছো। তুমি যদি উগ্র-স্বভাব (কটুভাষী) ও কঠোর চিত্ত হতে তাহলে এসব লোক তোমার চারদিক থেকে দূরে সরে যেতো।"-আলে ইমরান।।১৫৯

আল কুরআনের এইসব আয়াত এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) এইসব উক্তি থেকে অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায় আল ইসলাম কোমলতা-উদারতা-ক্ষমাশীলতার ওপর কতোখানি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

আল কুরআন এবং আল হাদীসের শিক্ষাকে সামনে রেখেই নেতৃত্বকে কর্মীদের সাথে বিনম্র আচরণ করতে হবে।

একটি মজবুত সংগঠনের পরিচয়

আদর্শিক ভিত্তিতে কোন ভূখন্ডের সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হলে একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। বলিষ্ঠ সংগঠিত উদ্যোগ ছাড়া কায়েমী স্বার্থবাদের অকটোপাস থেকে সমাজকে মুক্ত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেই জন্যই আদর্শিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে দীর্ঘ সময় ধরে একটি শক্তিশালী বা মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার জন্য অহর্নিশ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কোন সংগঠন ক্রমশঃ শক্তি অর্জন করে গণ মানুষের সংগঠনে পরিণত হলেই কাংখিত পরিবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখানে আমরা সংক্ষেপে একটি মজবুত সংগঠনের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

১. সুযোগ্য নেতৃত্বের সমাবেশ

একটি সংগঠনের কেন্দ্র থেকে শুরু করে শিকড় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব দানের জন্য উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ প্রয়োজন। যেহেতু সংগঠনের কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব এই সকল ব্যক্তিই পালন করে থাকেন সেহেতু তাঁদের যোগ্যতার মান অনুযায়ীই সংগঠনের পরিকল্পনা প্রণীত হয় এবং তাঁদের যোগ্যতার মান অনুযায়ীই তা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

সংগঠনের যেই স্তরে বা যেই অঞ্চলে সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ থাকেন সেই স্তরে বা সেই অঞ্চলে কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জিত হয় এবং কর্ম এলাকায় তাঁদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সংগঠনের কোন স্তরে বা কোন কর্ম এলাকায় নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দুর্বল হলে সেখানে গিয়ে কাজের গতি শ্লথ হয়ে পড়তে বাধ্য। শুধু তাই নয় সেখানে গিয়ে কাজ থমকেও দাঁড়াতে পারে। ফলে পরবর্তী স্তরে কাজ সম্প্রসারিত হওয়া অথবা সাংগঠনিক তৎপরতার প্রাণবন্যা নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছানো দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়।

অতএব সংগঠনের অগ্রগতির স্বার্থে এর সকল স্তরে সুযোগ্য নেতৃবর্গের সমাবেশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে সাংগঠনিক মজবুতির প্রথম ও সর্ব প্রধান শর্ত।

২. নবীনদেরকে সম্পৃক্ত করার সক্ষমতা

এটা সত্য যে, প্রবীনের অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই। তেমনিভাবে এটাও সত্য যে,নবীনদের কর্মোদ্দীপনার কোন বিকল্প নেই। কাজেই একটি সংগঠনে প্রবীন ও

নবীনের সম্মিলন প্রয়োজন। যেই সংগঠন ক্রমান্বয়ে তরুণ তাজাদেরকে সংগঠনের সর্বস্তরে সম্পৃক্ত করে নিতে পারেনা তা এক পর্যায়ে এসে গতিশীলতা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য।

যোগ্যতাসম্পন্ন নবীন কর্মীগণ যাতে সংগঠনে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় সেইদিকে নজর রাখা সংগঠনের সকল স্তরের নেতৃবর্গের একটি বিশেষ কর্তব্য। বস্তুতঃ কোন সংগঠনে নবীনদের বিপুল সমাবেশ ঘটলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সেই সংগঠন সাংগঠনিক মজবুতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করলো।

৩. ব্যবস্থাপনায় যোগ্য ব্যক্তিদের সমাবেশ

সাংগঠনিক কর্মকান্ডে মূল নেতৃত্ব ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের জন্য অনেক লোক নিয়োগ করতে হয়। অফিস পরিচালনা, গ্রন্থাগার পরিচালনা, হিসাব রক্ষণ ইত্যাদি কাজের জন্যও বেশ কিছু লোকের প্রয়োজন। এই সব কাজের পদগুলো বাহ্যতঃ ছোট বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এইগুলোও খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ। এইসব পদে যাঁরা থাকেন তাঁরাই মূল নেতৃত্বকে ব্যাক আপ সার্ভিস দিয়ে থাকেন। তাঁরা যদি সঠিক সময়ে এবং সঠিক মানে ব্যাক আপ সার্ভিস দিতে না পারেন তাহলে মূল নেতৃত্ব সঠিক সময়ে এবং সঠিক মানে তাঁদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হওয়ার আশংকা রয়েছে। সেই জন্য এই পদগুলোতেও যাতে দক্ষ ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটতে পারে সেইদিকে মূল নেতৃত্বকে বিশেষ নজর দিতে হবে। 'একজন কর্মী বেকার। কোথাও কর্মসংস্থান করা যাচ্ছে না। কাজেই সংগঠনের অফিসে ঢুকিয়ে দাও'-এই ধরনের দৃষ্টিভংগিতে কোন ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনার কোন দায়িত্ব দেয়া সমীচীন নয়। বেকার কর্মীর জন্য প্রয়োজন বোধে কল্যাণ ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তাই বলে অযোগ্য বা কমযোগ্য হওয়া সত্বেও তাঁকে ব্যাক আপ সার্ভিস দেবার মতো কোন পদে কিছুতেই নিয়োগ করা উচিত নয়। সঠিক পদে সঠিক ব্যক্তির নিয়োগও একটি মজবুত সংগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট।

৪. প্রয়োজনীয় ও উন্নততর উপকরণের সমাবেশ

দিনের পর দিন মানুষের বস্তু জ্ঞান বিস্তৃতি লাভ করছে। মানুষ জীবনকে সহজ ও গতিশীল করার জন্য নিত্য নতুন উপকরণ আবিস্কার করছে। এইগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে দূরতম অঞ্চলের সাথে যোগাযোগসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা মানুষ লাভ করছে। দুনিয়ার অপরাপর সংগঠন সেইগুলো ব্যবহার করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে আর একটি ইসলামী সংগঠন সেইগুলো ব্যবহার না করে পিছিয়ে থাকবে এটা মোটেই অভিপ্রেত নয়। টেলিফোন, টেলেক্স, অডিও ভিডিও ইকুইপমেন্টস, ফটোষ্ট্যাট মেশিন, কম্পিউটার মেশিন, মোটর সাইকেল,

মোটর গাড়ী ইত্যাদি বর্তমান কালে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় উপকরণ। প্রয়োজনের তীব্রতা সামনে রেখে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে এইগুলোর সমাবেশ ঘটাতে হবে ক্রমান্বয়ে। এইগুলোর সমাবেশ নিঃসন্দেহে একটি গতিশীল সংগঠনের পরিচয় বহন করে।

৫. শিকড় পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

একটি ভূখন্ডের প্রতিটি এলাকা সংগঠনের আওতাভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সংগঠনের আদর্শিক ধ্যান-ধারণা, এর দৃষ্টিভংগী এবং বক্তব্য গণ-মানুষের কাছে সঠিক ভাবে পৌছাতে হলে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত এর প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন। শিকড় পর্যায় পর্যন্ত সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটানো ছাড়া এটি নিশ্চত করা সম্ভব নয়।

তদুপরি একটি সংগঠনতো শেষাবধি গণমানুষের সংগঠন হতে চায়। তাই গণমানুষ যতো জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সংগঠনের শাখা সেখান পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হবে। সংগঠন গণমানুষের বহুমুখী সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব পালন করবে, জনগণকে সাথে নিয়েই কায়েমী স্বার্থবাদের ভিত কাঁপিয়ে তুলবে। আর সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগঠন গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত থাকতে হবে।

রাজধানী থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র সংগঠনের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠলে, ধরে নিতে হবে সংগঠন সাংগঠনিক মজবুতির আরেকটি জরুরী শর্ত পূরণ করতে পেরেছে।

৬. নেতৃত্ব ও কর্মীদের সুসম্পর্ক

কোন সংগঠনে নেতৃবৃন্দ যদি বস্ সেজে যান এবং কর্মীগণকে ভৃত্য মনে করেন তাহলে সেই সংগঠন বেশী দিন বেঁচে থাকার কথা নয়। এই ধরনের কোন সংগঠনে একজন কর্মী দুনিয়াবী কোন স্বার্থে হয়তোবা বাহ্যিকভাবে নেতৃত্বের আনুগত্য করতে পারে। কিন্তু তার অন্তরে নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকার কথা নয়। এবং তার অন্তরে নেতৃত্বের প্রতি সীমাহীন ঘৃণাই বাসা বেঁধে থাকার কথা। যেই সংগঠনে নেতৃত্ব এবং কর্মীদের মধ্যকার সম্পর্কের ধরন এই সেই সংগঠনকে মজবুত সংগঠন বলার কোন উপায় নেই।

যেই সংগঠনের নেতৃত্ব কর্মীদেরকে আন্তরিকভাবেই ভাই মনে করেন, তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন এবং সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ান সেই সংগঠনের কর্মীবৃন্দ স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে, অকাতরে তাঁর বা তাঁদের নির্দেশ মেনে নেবে এবং নেতৃত্বের নির্দেশে যেই কোন ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে,এটাইতো স্বাভাবিক।

সাংগঠনিক কর্মকান্ডে এই কর্মীদের ভূমিকা ভাড়াটে কর্মীদের ভূমিকার মতো হবে

না। এমতাবস্থায় সংগঠনের কাজকে তারা নিজেদেরই কাজ মনে করবে এবং সর্বোত্তমভাবে সেই কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে।

তাই নেতৃত্ব ও কর্মীদের সুসম্পর্ক সাংগঠনিক মজবুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৭. কর্মীদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক

কোন সংগঠনে বহুসংখ্যক কর্মীর সমাবেশ ঘটলেই তাকে মজবুত সংগঠন বলা যায় না যদিনা সেই সংগঠনের কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিরাজ করে।

পারস্পরিক সুসম্পর্ক থাকলেই এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সুখ-দুঃখের সাথী হতে পারে, নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অপরের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে পারে।

যেই সংগঠনের কর্মীগণ নিজের প্রয়োজনের ওপর অপরের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে পারে সেই সংগঠনের শক্তি অনেক।

সেই সংগঠনের কর্মীদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ থাকে না। সেই কারণেই থাকেনা পরনিন্দা। আর হিংসা-বিদ্বেষ এবং পরনিন্দার অনুপস্থিতি সঠিক অর্থেই একটি সংগঠনের পরিপূর্ণ সুস্থতার লক্ষণ। কাজেই কোন সংগঠনের কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিরাজ করলে সেই সংগঠন সাংগঠনিক মজবুতির অত্যাবশ্যকীয় একটি বৈশিষ্ট অর্জন করতে পেরেছে, এই কথা জোর দিয়েই বলা যায়।

৮. ভারসাম্যপূর্ণ বহুমুখী তৎপরতা

একটি সংগঠনের থাকে নানামুখী কাজ। বিশেষ করে একটি আদর্শিক সংগঠন বহু ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে থাকে। আদর্শিক কনসেপ্টগুলোর উপস্থাপনার মাধ্যমে চিন্তা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি, ব্যক্তির স্বকীয়তায় আমূল পরিবর্তন সাধন, সামাজিক ব্যাধি ও সমস্যাগুলো নিরসনকল্পে পরিচালিত সংস্কারধর্মী কর্মকান্ড এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে সৎ ব্যক্তিদের উদ্বর্তন প্রয়াস একটি বাস্তবধর্মী সংগঠনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য পরিচালিত হয় বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড। এইসব কর্মকান্ডের কোন একটি দিকও না বাহুল্য, না অপ্রয়োজনীয়। এইগুলোকে সামনে রেখেই সংগঠন কর্ম এলাকায় কর্ম তৎপরতা চালায়, সংগঠনের মাঠ-কর্মীরা মাঠ চষে বেড়ায়। কিন্তু এই মাঠ চষে বেড়ানোর কাজটা একপেশে হয়ে গেলেই সমস্যা। সবগুলো কাজই যদি যুগপতভাবে সম্পাদিত হয় তবেই সোনায় সোহাগা। সামগ্রিক কর্মকান্ডে যাতে পরিপূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা পায় সেইদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখবেন সংগঠনের

পরিচালকবৃন্দ। কোন একটি দিককেও উপেক্ষা বা অবহেলা না করে ভারসাম্য রক্ষা করে যদি সংগঠন কর্মতৎপরতা চালাতে পারে তাহলে এই সংগঠন মজবুত সংগঠন নামে আখ্যায়িত হওয়ার দাবী করতে পারে সংগতভাবেই।

৯. আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা

একটি সংগঠনের বিভিন্নমুখী তৎপরতা পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থাভাবে যদি কোন সাংগঠনিক কাজ ব্যাহত হয় এটা নিঃসন্দেহেই দুর্ভাগ্যজনক। তদুপরি এটা সাংগঠনিক দুর্বলতার পরিচায়কও বটে।

একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান এর গোটা কর্মী বাহিনীকেই দিতে হবে। এর জন্য কর্মী বাহিনীর মধ্যে অব্যাহতভাবে মটিভেশন প্রদানের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবে কর্মী বাহিনীর বাইরেও সংগঠনের প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ধনী ব্যক্তিদেরকে এই সংগঠনে অর্থদানের মর্যাদা এবং প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে বুঝাতে হবে। তাহলে তাঁরাও এই সংগঠনের তহবিলে অকাতরে দান করতে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করা যায়।

মোট কথা, অর্থাভাবে সংগঠনকে পংগু করে রাখার কোন উপায় নেই। শুভাকাংখীদের কাছ থেকে কোন অর্থ পাওয়া না গেলেও সংগঠনের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করতে হবে এবং তা করতে হবে সংগঠনের কর্মীদের কাছ থেকেই। কোন সংগঠন যখন এর কর্ম এলাকায় বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিজেই দিতে পারে তখন একে শক্তিশালী সংগঠন গণ্য করার একটি মজবুত ভিত্তি পাওয়া যায়।

১০. কর্ম এলাকায় নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি

সংগঠন যেই ভূখন্ডে বা যেই অঞ্চলে কাজ করে থাকে সেই ভূখন্ড বা অঞ্চলে এর নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী বাহিনীর ব্যাপক প্রভাব থাকা প্রয়োজন। অবশ্য এই প্রভাব এমনিতেই সৃষ্টি হয় না। সংগঠন যখন বহুমুখী তৎপরতা চালিয়ে জনগণের আস্থাভাজন হতে পারে তখনই এই প্রভাবের বিস্তৃতি ঘটে। আসলে সমাজের প্রতিটি মানুষই কল্যাণের কাংগাল। তারা যখন নিশ্চিত হতে পারে যে এই সংগঠন এবং এর নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী সত্যিকার অর্থেই তাদের কল্যাণকামী তখন তারা এই সংগঠনের দিকে মানসিকভাবে ঝুঁকে পড়ে।

তখন তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশা জানাবার জন্য এদের কাছেই ছুটে আসে। তাদের নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য এদেরই সহযোগিতা কামনা করে। এই অবস্থাতে সংগঠন যদি তাদের প্রতি অর্থবহ কোন সহযোগিতা দিতে পারে তাহলে তারা কাগজ কলমে না হলেও আন্তরিকভাবেই এই সংগঠনেরই লোক হয়ে যায়।

কর্ম-এলাকায় এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলে নির্দ্বিধায় বলা চলে যে সংগঠন একটি মজবুত সংগঠন হওয়ার অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

১১. বৈরী শক্তিগুলোর চক্রান্ত নস্যাৎ করার ক্ষমতা

বৈরী শক্তিগুলোর ইসলামী সংগঠনের উপস্থাপিত আদর্শের বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। কেন না যেই কোন যুক্তি-তর্কে এটাই প্রমাণিত হয় যে ইসলামই সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ। যারা এর কল্যাণকারিতা এবং সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে না তারা অন্যায়ভাবে কোমর বেঁধে এর বিরোধিতায় নেমে পড়ে। যেহেতু তারা আদর্শিকভাবে একে মুকাবিলা করতে পারে না সেহেতু তারা একটি ভয়াল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এই সংগঠনের কর্মী বাহিনী এবং জনগণের মাঝে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করতে চায়। তদুপরি মিথ্যা প্রচারণার ঝড় তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালায়।

বৈরী শক্তিগুলোর এই চক্রান্তজাল ছিন্ন করেই ইসলামী সংগঠনকে সামনে এগুতে হবে। একে অবশ্যই জনগণের কাছে পৌঁছতে হবে। জনগণ যাতে বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচারে প্রভাবিত হতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। আর সেই জন্য ব্যাপক গণ-সংযোগ, বিপুল সংখ্যক প্রচার পত্র বিতরণ, পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মোট কথা বৈরী শক্তিগুলোর যাবতীয় অপকৌশল ভন্ডুল করে দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্তি মুক্ত রেখে জনগণ এবং সংগঠনের মধ্যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সংগঠন যদি এটি নিশ্চিত করতে পারে তাহলে বুলন্দ কণ্ঠেই বলা যাবে যে সংগঠন মজবুতির আরেকটি প্রধান শর্ত পূরণ করতে পেরেছে।

আমানাত ও আমানাতদারী

সাধারণত গচ্ছিত অর্থ বা বস্তুকে আমানাত বলা হয়। আর গচ্ছিত অর্থ বা বস্তু সঠিকভাবে রক্ষণা বেক্ষণ করাকে বলে আমানাতদারী।

প্রকৃতপক্ষে আমানাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। তদ্রূপ আমানাতদারীও।

এই পরিভাষা দুইটির ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব নিয়েই এই নিবন্ধে আমাদের আলোচনা।

১। খিলাফাতও আমানাত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ط

আল আহযাব ॥ ৭২

"আমি এই আমানাত (খিলাফাত) আসমান, পৃথিবী ও পর্বতমালার নিকট পেশ করি, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়নি, ভয় পেয়ে গেলো। আর মানুষ এই বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিলো।"

"..... এখানে "আমানাত" অর্থ সেই "খিলাফাত" যা ... মানুষকে দুনিয়ায় দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে আনুগত্য ও অবাধ্যতার যেই স্বাধীনতা দান করেছেন এবং স্বাধীনতা ব্যবহার করার জন্য তাকে অসংখ্য সৃষ্টির ওপর যেই কর্তৃত্ব ক্ষমতা দিয়েছেন।...

এই সব ক্ষমতা মানুষ নিজেই অর্জন করেনি বরং আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। এই গুলোর সঠিক ব্যবহার কিংবা অন্যায় ব্যবহারের জন্য তাকে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে। আলকুরআনের অন্যান্য স্থানে এই গুলোকে "খিলাফাত" শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আর এখানে "আমানাত" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।"

দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সূরাহ আল আহযাবের তাফসীর, টীকা-১২০

২। আল্লাহর আহকামগুলো মুমিনদের নিকট আমানাত

'আলমুনজিদ' আরবী ভাষার প্রখ্যাত অভিধান। এতে আমানাত শব্দের অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

مَـا فَرَضَـهُ اللّٰهُ عَلَـى الْعِبَـادِ. "আমানাত হচ্ছে যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য ফারয করেছেন।"

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) বলেছেন,

اَلْاَمَانَاتُ الْاَعْمَالُ الَّتِىْ ائْتَمَنَ اللّٰهُ عَلَيْهَا الْعِبَادَ.

'আমানাত হচ্ছে ঐসব আমল যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর (প্রতিপালনের জন্য) ন্যস্ত করেছেন।'

আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) বলেছেন,

اَلصَّلَاةُ اَمَانَةٌ، وَالْوُضُوْءُ اَمَانَةٌ، وَالْغُسْلُ اَمَانَةٌ، وَالْوَزْنُ اَمَانَةٌ، وَالْكَيْـلُ اَمَانَـةٌ، وَاَعْظَمُ ذٰلِكَ الْوَدَائِعُ.

মুসনাদে আহমাদ, সুনানু আলবাইহাকী।

"সালাত আমানাত।

উযু আমানাত।

গোসল আমানাত।

সঠিক পরিমাপ আমানাত।

সঠিকভাবে মেপে দেওয়া আমানাত।

বড়ো আমানাত কারো কাছে সম্পদ গচ্ছিত রাখা।"

৩। দায়িত্বপূর্ণ পদগুলোও আমানাত। যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে সেইগুলো ন্যস্ত করা আমানাতদারী

আল্লাহ বলেন, اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا لا

আন্‌নিসা ॥ ৫৮

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানাত তার প্রকৃত হকদারের নিকট সুফর্দ করতে।"

রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

إِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ اِذَا أُسْنِدَ الْاَمْرُ اِلَىٰ غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

"যখন আমানাত বিনষ্ট হতে দেখবে তখন কিয়ামাতের অপেক্ষা করবে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, কিভাবে আমানাত বিনষ্ট হবে? তিনি বললেন, 'যখন সামষ্টিক দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হবে তখন কিয়ামাতের অপেক্ষা করবে (অর্থাৎ বুঝবে যে কিয়ামাত নিকটবর্তী)।"

৪। মুসলিমদের অধিকার দায়িত্বশীলদের নিকট আমানাত

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَا مِنْ وَّالٍ يَّلِىْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ غَاشٌّ لَّهُمْ اِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

মা'কাল ইবনুল ইয়াসার (রা)। সহীহ মুসলিম, সহীহ আলবুখারী।

"মুসলিমদের সামষ্টিক কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি তাদের সাথে খিয়ানাত করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।"

৫। তত্ত্বাবধানের অধীন ব্যক্তিরা তত্ত্বাবধায়কের নিকট আমানাত

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، فَا لْاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَعِيَّةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা)। সহীহ মুসলিম, সহীহ আলবুখারী।

"জেনে রাখ, তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্ট্রের আমীর জন-সাধারণের তত্ত্বাবধায়ক। এই

সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধায়ক এবং একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ ও তার সন্তানদের তত্ত্বাবধায়িকা। (এইভাবে) তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

৬। কারো প্রযত্নে কাউকে সুফর্দ করা আমানাত

قَالُوْا يٰاَبَانَا مَالَكَ لاَتَأْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ. ইউসুফ ॥ ১১

"তারা বললো : আব্বাজান, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের ওপর আস্থা রাখেন না অথচ আমরা তার কল্যাণকামী।"

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلاَّ كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ. ইউসুফ ॥ ৬৪

"সে বললো : আমি কি তাকে তোমাদের কাছে সেইভাবেই সুফর্দ করবো, যেইভাবে আগে তার ভাইয়ের ব্যাপারে করেছিলাম? আল্লাহই উত্তম হিফাজতকারী আর তিনিই সবচে' বেশি অনুগ্রহকারী।"

এই দুইটি আয়াতে কারো প্রযত্নে কাউকে সুফর্দ করাকে আমানাত বলা হয়েছে।

৭। প্রাতিষ্ঠানিক, সাংগঠনিক, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তাও আমানাত

আল্লাহ বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لاَيَأْلُوْنَكُمْ خَبَالاً ط

আলে ইমরান ॥ ১১৭

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের গোপন বিষয়ের সাক্ষী বানাবে না, তারা তোমাদের অসুবিধার সুযোগ নিতে একটু কুণ্ঠিত হবে না।"

অর্থাৎ নিজেদের গোপন বিষয়গুলো নিজেদের মধ্যে আমানাত। এই গুলো ফাঁস করে দেয়া আমানাতের খিয়ানাত।

৮। আল্লাহর নির্দেশ : আমানাতের খিয়ানাত করো না

আল্লাহ বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

আল আনফাল ॥ ২৭

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খিয়ানাত করো না, খিয়ানাত করো না নিজেদের আমানাতসমূহ।"

"নিজেদের "আমানাতসমূহ" মানে কারো ওপর আস্থা স্থাপন করে যেইসব দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়। তার আনুগত্য করা ও অংগীকার পালনের দায়িত্বও হতে পারে।

অথবা কোন সামাজিক চুক্তি পালন, দলের গোপনীয়তা রক্ষা করা বা ব্যক্তিগত ও দলীয় সম্পত্তি রক্ষা করা কিংবা এমন কোন পদের অংগীকারও হতে পারে যা কোন ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে দল তার হাতে সুফর্দ করে দেয়।"

দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সূরাহ আল আনফালের তাফসীর, টীকা-২২

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِيْ اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ط

আলবাকারাহ ॥ ২৮৩

"তোমাদের কেউ যদি কারো ওপর আস্থা স্থাপন করে তার সাথে কোন কাজ করে তবে যার ওপর আস্থা স্থাপন করা হয়েছে সে যেন আমানাত যথাযথভাবে আদায় করে ও আল্লাহকে ভয় করে চলে।"

৯। আল্লাহর রাসূল (সা) খিয়ানাত করা থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِيَّاكُمْ وَالْخِيَانَةَ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

সুনানু আবী দাউদ, সুনানু ইবনু মাজাহ, সুনানু আন-নাসায়ী।

"খিয়ানাত থেকে তোমরা বেঁচে থাকো। এটি খুবই মন্দ আভ্যন্তরীন অভ্যাস।"

১০। আমানাতের খিয়ানাত ঈমানের ত্রুটি নির্দেশ করে

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَاإِيْمَانَ لِمَنْ لَاأَمَانَةَ لَهُ

"যার আমানাতদারী নেই তার ঈমান নেই।"

আনাস (রা)। সুনানু আল বাইহাকী, মুসনাদে আহমাদ, ইবনু হিব্বান, মিশকাতুল মাসাবীহ।

১১। নিফাক ও খিয়ানাত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ.

আবু হুরাইরাহ (রা)। সহীহ আল বুখারী-২৪৮৭।

"মুনাফিকের পরিচয় চিহ্ন তিনটি ঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে।"

১২। খিয়ানাত না করা পর্যন্ত আল্লাহ দুই পার্টনারের সাথে তৃতীয় জন হয়ে থাকেন

আল্লাহ বলেন,

اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ.

আবু হুরাইরাহ (রা)। সুনানু আবী দাউদ।

"আমি দুই জন পার্টনারের সাথে তৃতীয় জন হয়ে থাকি যতক্ষণ তাদের একজন অপর জনের সাথে খিয়ানাত মূলক আচরণ না করে। যখন তারা একে অপরের স্বার্থ খিয়ানাত করে আমি সরে দাঁড়াই আর শাইতান হাযির হয়।"

১৩। খিয়ানাতকারীর সাথেও খিয়ানাত করা নিষেধ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنْ اُئْتَمَنَكَ وَلَاتَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

আবু হুরাইরাহ (রা)। জামে আত তিরমিযী।

"আমানাত ফিরিয়ে দাও। তোমার কিছু খিয়ানাত করলেও তুমি তার কিছু খিয়ানাত করো না।"

১৪। খাঁটি মুমিন চরিত্রে খিয়ানাত ও মিথ্যা কথন থাকতে পারে না

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

يَطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.

মুসনাদে আহমাদ।

"মুমিন চরিত্রে অনেক কিছুই থাকতে পারে, কিন্তু খিয়ানাত ও মিথ্যা কথন থাকতে পারে না।"

১৫। কল্যাণপ্রাপ্ত মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট আমানাতদারী

আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ.

আল মুমিনূন ॥ ৮।

"এরা নিজেদের আমানাতগুলো ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"

১৬। আল্লাহ আমানাতের খিয়ানাতকারীকে পছন্দ করেন না

আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ.

আলহাজ ॥ ৩৮।

"অবশ্যই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্নকে পছন্দ করেন না।"

১৭। আল্লাহর রাসূল (সা) খিয়ানাত করা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেন

রাসূলুল্লাহ (সা) দুআ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ.

সুনানু আবী দাউদ।

"হে আল্লাহ, আমি ক্ষুধা অনাহার থেকে আপনার আশ্রয় চাই, কেননা তা হচ্ছে নিকৃষ্ট শয়ন সংগী। আমি খিয়ানাত করা থেকে আপনার আশ্রয় চাই, কেননা তা হচ্ছে নিকৃষ্ট আভ্যন্তরীন অভ্যাস।"

১৮। খিয়ানাতকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের (সা) ভবিষ্যদ্বাণী

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

... اِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُوْنُــوْنَ وَلاَيُؤْتَمَنُــوْنَ وَيَشْــهَدُوْنَ وَلاَيَسْتَشْــهِدُوْنَ وَيَنْذُرُوْنَ وَلاَيَفُوْزَ.

ইমরান ইবনু হুছাইন (রা)। সহীহ আল বুখারী-২৪৫৯।

..."তোমাদের পরে এমন লোকেরা আসবে যারা খিয়ানাত করবে, তাদের মাঝে আমানাতদারী থাকবে না, তারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না, তারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না।"

১৯। মহাপ্রলয়ের আগে সর্বপ্রথম আমানাতদারী তুলে নেয়া হবে

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

اَوَّلَ مَايُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْاَمَانَةَ.

সুনানু আবী দাউদ, সুনানু ইবনু মাজাহ, সুনানু আননিসায়ী।

"মানুষ থেকে সর্বপ্রথম যেই জিনিষ উঠিয়ে নেয়া হবে তা হচ্ছে আমানাতদারী।"

২০। খিয়ানাতকারী আত্মসাৎকৃত বস্তু নিয়ে আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হবে

আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج

আলে ইমরান ॥ ১৬১।

"খিয়ানাতকারী কিয়ামাতের দিন আত্মসাৎকৃত দ্রব্য নিয়ে উপস্থিত হবে।"

২১। খিয়ানাতকারী নাজাত পাবে না

كَانَ عَلٰى ثُقْلِ النَّبِيِّ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ هُوَ

فِي النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা)। সহীহ আলবুখারী-২৮৪৩।

"নবীর (সা) সামান দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পিত ছিলো কারকারাহ নামক এক ব্যক্তির ওপর। সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "সে জাহান্নামবাসী।" লোকেরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখলো ঐ ব্যক্তি মালে গানীমাহ থেকে একটি আবাহ আত্মসাৎ করেছে।"

একটি নগণ্য বস্তু আত্মসাৎ করার কারণে নবীর (সা) সাথী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

২২। উপসংহার

আলকুরআনের উদ্ধৃত আয়াতগুলো ও আল্লাহর রাসূলের (সা) উদ্ধৃত এই হাদীসগুলোই আমানাত ও আমানাতদারী সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভংগি স্বচ্ছ করার জন্য যথেষ্ট। আমানাতদারী একজন খাঁটি মুমিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট। আমরা যেনো কখনো এই বৈশিষ্ট হারিয়ে দুর্ভাগ্যের শিকার না হই, তার প্রতি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ইসলামের দৃষ্টিতে ভালো ব্যবহার

'ব্যবহার' শব্দের অর্থ আচরণ। অর্থাৎ একের প্রতি অপরের যেই আচরণ প্রকাশ পায় তাকেই ব্যবহার বলে। ইসলাম সুন্দর ব্যবহার, ভালো ব্যবহার কিংবা উত্তম ব্যবহারকে খুবই মূল্য দেয়। প্রকৃত পক্ষে আল কুরআন ও আল হাদীস প্রত্যেক মুমিনকে অপরের সংগে ভালো ব্যবহার করার তাকিদ দেয়। ভালো ব্যবহারের অধিকারী না হয়ে উত্তম মুমিন হওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের (১) আব্বা-আম্মা, (২) আমাদের স্ত্রী, (৩) আমাদের সন্তান, (৪) আমাদের ভাই-বোন, (৫) আমাদের কাজের লোক, (৬) আমাদের প্রতিবেশী, (৭) আমাদের মেহমান এবং (৮) অন্যান্য বয়োজ্যষ্ঠ ও বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তি আমাদের নিকট ভালো ব্যবহার পাওয়ার হকদার। আর তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। আসুন, এই সম্পর্কে আল কুরআন ও আল হাদীসের নির্দেশগুলো জানার চেষ্টা করি।

১. আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার

আমাদেরকে বড়ো করতে গিয়ে আব্বা-আম্মাকে নানাবিধ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। আব্বা কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করতেন। আম্মা সেই অর্থ দ্বারা সংসার গুছাতেন। তবে আমাদের লালন পালনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অবদান আম্মারই বেশি।

আমরা যখন শিশু ছিলাম আম্মা প্রতিদিন পনর থেকে বিশবার তাঁর বুকের দুধ আমাদেরকে পান করাতেন। আমরা এতো দুর্বল ছিলাম যে বিছানাতেই মলমূত্র ত্যাগ করতাম। অন্যরা নাক সিটকালেও আম্মা কিন্তু সহৃদয়তার সাথে আমাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতেন। নিজ হাতে নোংরা কাপড়গুলো ধুয়ে শুকিয়ে আমাদের ব্যবহার উপযোগী করে রাখতেন। শীতের কারণে আমরা কষ্ট অনুভব করে কেঁদে উঠলে তিনি ছুটে এসে আমাদেরকে কোলে তুলে নিয়ে বুকের উষ্ণতায় আগলে রাখতেন। আমাদের অসুখ করবে ভেবে আম্মা তাঁর অনেক প্রিয় খাদ্য খেতেন না। আমাদের বয়স কয়েক মাস হওয়ার পর বুকের দুধের সাথে সহজপ্রাচ্য বিকল্প খাদ্য তৈরি করে আম্মা আমাদেরকে খাওয়াতেন। আমরা কথা বলতে জানতাম না। আম্মা একটি দুইটি করে আমাদেরকে কথা শিখালেন। আমরা হাঁটতে পারতাম না। আম্মা আমাদেরকে হাঁটা শিখালেন। আমরা কাউকে

চিনতাম না। আম্মা আমাদেরকে তাঁদের পরিচয় শিখালেন। ঘরের কিংবা বাইরের কোন কিছুর নাম আমরা জানতাম না। আম্মা আমাদেরকে সেইগুলোর নাম শিখালেন।

আমাদের বয়স বাড়তে থাকে। আর আম্মার সান্নিধ্যে আমাদের শিক্ষারও বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। তিনি আমাদেরকে পোষাক পরা শিখালেন। তিনি আমাদেরকে লেখা শিখালেন। তিনি আমাদেরকে গণনা শিখালেন। তিনি আমাদেরকে সালাম শিখালেন, মুসাফাহা শিখালেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ ও রাসূল (সা) সম্পর্কে জ্ঞান দিলেন। তিনিই আমাদেরকে সালাত শিখালেন। তিনি আমাদেরকে শিষ্টাচার শিখালেন। তিনি আমাদেরকে ন্যায় ও অন্যায় সম্পর্কে ধারণা দিলেন। বড়ো হয়ে মুসলিম হিসেবে যেইসব কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে সেইগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে জ্ঞান দিলেন।

আম্মার বুকের দুধ পান করে আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করেছি। আম্মার স্নেহ-মমতায় পালিত হয়ে আমরা মানসিকভাবে সুস্থ মানুষরূপে গড়ে উঠেছি। আম্মার কাছে শিক্ষা লাভ করে আমরা আমাদের জীবনোদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছি।

আব্বা দিনের বেশির ভাগ সময় অর্থ উপার্জনের জন্য খাটাখাটি করতেন। সকাল-সন্ধ্যায় তিনি আমাদের পেছনে সময় দিতেন। সালাতের সময় আমাদেরকে মাসজিদে নিয়ে যেতেন। বাইরের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দিতেন। উচ্চ শিক্ষিত হবার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করতেন।

আমাদের জন্ম লাভ, বেঁচে থাকা, বড়ো হয়ে উঠা ও শিক্ষা লাভের পেছনে আব্বা-আম্মার অবদান বিরাট। তাঁরা আমাদের জন্য সবকিছু করেছেন। আর সবকিছুই করেছেন নিঃস্বার্থভাবে। সেই জন্যই আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁদের প্রতি শোকরগুজার হতে বলেছেন। তাঁদের সাথে বিনম্রভাবে কথা বলতে বলেছেন। কোন অবস্থাতেই তাঁদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের সেবাযত্ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাঁদের জন্য দু'আ করতে বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, অতি বার্ধক্য একটি কঠিন সময়। এই সময়টিকে দ্বিতীয় শিশুকালও বলা হয়। এই সময় মানুষ দৈহিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়, তাদের মিজায খিটখিটে হয়ে যায়। অল্পতে তারা রেগে যায়। সন্তানগণ যদি এই দ্বিতীয় শিশুকাল সম্পর্কে সচেতন থাকে তাহলে বুড়ো আব্বা-আম্মার দৃশ্যত অনাকাংখিত আচরণ

তাদেরকে মোটেই বিস্মিত কিংবা ব্যথিত করবে না। এমতাবস্থায়ও তারা মুখে হাসি নিয়ে পরম ধৈর্যসহকারে আব্বা-আম্মার সেবাযত্ন করবে। এই বিষয়টির সচেতনতা না থাকলে সন্তানের পক্ষ থেকে আব্বা-আম্মার প্রতি সঠিক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ত্রুটি হয়ে যেতে পারে।

আব্বা-আম্মার প্রতি ভালো ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ـ

আল আনকাবূত ॥ ৮

"আমি মানুষকে তার আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি।"

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَلاَتَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ـ

বানী ইসরাঈল ॥ ২৩, ২৪

"তোমার রব ফায়সালা দিয়েছেন যে তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না এবং তোমাদের আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমার কাছে যদি তাদের একজন কিংবা উভয় জন বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তুমি 'উহ' পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে তিরস্কার করবে না। তাদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ কথা বলবে। তাদের প্রতি অনুকম্পার ডানা বিস্তার করে রাখবে। আর বলবে : হে আমার রব, তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেমন তাঁরা ছোটবেলা আমাকে পরম স্নেহে পালন করেছেন।"

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ـ

আল আহকাফ ॥ ১৫

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি সে যেনো তার আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করে। তার আম্মা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে ও কষ্ট করে তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস সময় লেগেছে।"

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصَالُـهُ فِـىْ عَـامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط

লোকমান ॥ ১৪

"আমি মানুষকে তার আব্বা-আম্মার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি। তার আম্মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে বহন করেছে। দুই বছর তাকে দুধ পান করিয়েছে। অতএব আমার প্রতি শোকরগুজার হও। আর শোকরগুজার হও তোমার আব্বা-আম্মার প্রতি।"

বৃদ্ধাবস্থায় আব্বা-আম্মার সেবা-যত্ন করা কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝাতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ مَـنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْـهِ عِنْـدَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَـا اَوْ كِلاَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ

আবু হুরাইরাহ (রা), সহীহ মুসলিম।

"ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন,

ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন,

ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন যেই ব্যক্তি তার আব্বা-আম্মার একজনকে কিংবা উভয়জনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না।"

২. স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন :

اِنَّ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ـ

মুসনাদে আহমাদ।

"দুনিয়াটা তো সামগ্রীময়। তবে দুনিয়ার অতীব উত্তম সামগ্রী হচ্ছে নেক স্ত্রী।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ـ

আররূম ॥ ২১

"তিনি তোমাদের (স্বজাতির) মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জুড়ি সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন গভীর ভালোবাসা ও দয়া-অনুকম্পা।"

তবে সকল স্ত্রীই 'দুনিয়ার অতীব উত্তম সামগ্রী' হন না, সকল স্ত্রীর সান্নিধ্যে শান্তি ও স্বস্তি পাওয়া যায় না। সেই জন্য বিয়ের সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় এবং সত্যিকার অর্থে দীনদার পাত্রী বাছাই করতে হয়। এই সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ -

সহীহ মুসলিম, সহীহ আল বুখারী।

"চারটি বিষয় সামনে নিয়ে একজন মহিলাকে বিয়ে করার কথা বিবেচনা করা হয় : তার ধন-সম্পদ, তার বংশ-মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। দীনদার মহিলাকে বিয়ে কর। এতে তোমার কল্যাণ হবে।"

আল্লাহর রাসূল (সা) আরো বলেন,

لاَتَنْكِحُوْا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيْهِنَّ وَلاَ لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيْهِنَّ وَانْكِحُوْهُنَّ لِلدِّيْنِ وَلاَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرقَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ اَفْضَلُ -

ইবনু মাজাহ, আল বাইহাকী।

"তোমরা কেবল বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করো না। তাদের এই রূপ-সৌন্দর্য তাদেরকে নষ্ট করে দিতে পারে। তাদের ধন-সম্পদ দেখে বিয়ে করো না। ধন-সম্পদ তাদেরকে দুর্বিনীত করে দিতে পারে। দীনদারী দেখে বিয়ে কর। কৃষ্ণাংগী দাসীও অন্যদের চেয়ে উত্তম যদি সে দীনদার হয়।"

স্ত্রীর প্রাপ্য মাহর আদায় করার মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহারের সূচনা করতে হয়। মাহর স্ত্রীর অধিকার। এটি আদায় করা স্বামীর কর্তব্য।

আমাদের সমাজে পাত্রীপক্ষের চাপাচাপিতে কোন কোন বর মোটা অংকের মাহরের অংগীকার করেন যা তাঁর পক্ষে কখনো আদায় করা সম্ভব নয়। ফলে সারা জীবন তিনি স্ত্রীর কাছে ঋণী থেকে যান। আর ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়েই

ইন্তিকাল করে আল্লাহর আদালতে আসামী হিসেবে দাঁড়াতে বাধ্য হন। কেউ কেউ মাহ্র আদায় করার গুরুত্ব সম্পর্কেই সজাগ নন। ফলে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মাহ্র আদায় করেন না। আর আমাদের দেশের সামাজিক পরিবেশ এমন যে স্ত্রী তাঁর স্বামীর কাছে মাহ্রের অর্থ আদায় করার দাবি উত্থাপন করতে পর্যন্ত সাহস পান না। অথচ তাঁর এই প্রাপ্য আদায়ের জন্য স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা মোটেই আপত্তিকর নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্ত্রীর মাহ্র আদায় করার ব্যাপারে স্বামীকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন নিম্নের ভাষায়,

وَاٰتُوْا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ـ

আননিসা ॥ ৪

"তোমরা স্ত্রীদের মাহ্র সন্তুষ্ট চিত্তে আদায় কর।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করতে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। দোষে-গুণেই মানুষ। এটি যেমন সত্য পুরুষের জন্য, তেমনি সত্য স্ত্রীর ব্যাপারে। কোন স্ত্রীর কোন ত্রুটি আমাদের নিকট খুবই অপছন্দনীয় হতে পারে। কিন্তু মহাজ্ঞানী আল্লাহ হয়তো এই ত্রুটিটিকেই কল্যাণের উৎস বানিয়ে রেখেছেন। সেই জন্য স্বামীর উচিত স্ত্রীর ঐ ত্রুটিটিকে বড়ো করে না দেখে তার গুণাবলীকে বড়ো করে দেখা। তাহলে স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করতে কোনই অসুবিধা হবে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُـوْا شَـيْئًا وَيَجْعَـلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ

আননিসা ॥ ১৯

"এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর হতে পারে যে তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছো যার মাঝে আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لاَ يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ ـ

সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ।

"কোন মুমিন যেনো কোন মুমিনার কোন একটি স্বভাবের কারণে তাকে ঘৃণা না করে। তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলেও অন্যগুলো দেখে সে খুশী হয়ে যেতে পারে।"

স্বামীর সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব, সন্তানকে দুধ পান করানো, সন্তানের যত্ন নেওয়া, সন্তানের শিক্ষা ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্ত্রীকেই আঞ্জাম দিতে হয়।

স্বামীগৃহের সকল সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ, গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য তৈরি, স্বামী পক্ষ ও স্ত্রীর আপন পক্ষের মেহমানদের আপ্যায়নের ব্যবস্থাকরণ, গৃহ-পরিবেশে ইসলামী কৃষ্টির লালন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁকেই আঞ্জাম দিতে হয়।

এই কাজগুলো শ্রম, মেধা ও প্রচুর সময় দাবি করে। একজন স্ত্রী তাঁর শ্রম, মেধা ও সময় নিয়োজিত করে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বাইরের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে কাজ করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আর স্ত্রী যাতে গৃহ-পরিবেশে অবস্থান করে তাঁর ওপর অর্পিত কর্তব্যগুলো সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারেন সেই জন্য অর্থ যোগান দেওয়া স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। আবার এইসব কর্মকাণ্ডে তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য এক বা একাধিক কাজের লোকের ব্যবস্থা করাও স্বামীর কর্তব্য।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি সদ্ভাব থাকে, প্রত্যেকেই যদি প্রত্যেকের কর্তব্য নিষ্ঠাসহকারে প্রতিপালন করে তাহলে একটি পরিবার অবশ্যই সুখী পরিবারে পরিণত হয়। এই পরিবারে মনোমালিন্য থাকেনা, ঝগড়া-বিবাদ থাকেনা, অশান্তি-অস্বস্তি থাকেনা। ফলে এই পরিবার সৎ ও যোগ্য লোক তৈরির কারখানায় পরিণত হয়। আর এইভাবে যদি অগণিত সৎ ও যোগ্য লোক গড়ে উঠতে থাকে, তার অনিবার্য পরিণতিতে গড়ে উঠে সুস্থ-সুন্দর সমাজ ও সভ্যতা।

উল্লেখ্য যে, ইসলামী পরিবার ইসলামী কৃষ্টির হিফাজতের জন্য একটি দুর্গের ভূমিকা পালন করে। মুসলিমদের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্গগুলো যদি ভেংগে পড়ে আর পরিবার দুর্গগুলো অক্ষত থাকে, তাহলে মুসলিমগণ সময়ের কোন অধ্যায়ে আপন কৃষ্টি নিয়ে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু পরিবার দুর্গ যদি ভেংগে যায় মুসলিমদের আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পরিবার-ব্যবস্থার এই গুরুত্ব সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই সজাগ থাকতে হবে এবং উভয়জন নিজ নিজ ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

স্ত্রীর অধিকারের প্রতি নজর রাখা যেমন স্বামীর কর্তব্য, তেমনিভাবে স্বামীর অধিকারের প্রতি নজর রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। তবে স্বামীকে যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন "আররিজালু কাউয়ামুনা 'আলান্নিসায়ে"-র মাধ্যমে কর্তৃত্ব ক্ষমতা দান করেছেন, সেহেতু স্বামীকেই অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এই ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

৩. সন্তানের সাথে ভালো ব্যবহার

সন্তান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আব্বা-আম্মার নিকট গচ্ছিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমানত।

সুষ্ঠু প্রতিপালন সন্তানের অধিকার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আম্মার বুকে দুধের যেই ধারা সঞ্চার করেন তা পান করা সন্তানের অধিকার। এই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা এক প্রকারের যুল্ম।

একটি সুন্দর নাম সন্তানের অধিকার। আব্বা-আম্মার কর্তব্য হচ্ছে সন্তানের একটি সুন্দর নাম রাখা। ইদানিং এমন সব নাম রাখতে দেখা যায় যেইগুলোর কোন অর্থই হয় না। তদুপরি নামের দ্বারা বুঝাই যায় না ছেলে বা মেয়েটি হিন্দু, খৃস্টান না মুসলিমের সন্তান। কেউ কেউ ভালো নাম রাখেন। আবার ডাকনাম বলে বিদঘুটে ধরনের নাম রাখেন। অথচ প্রধানত ডাকার জন্যই তো নাম। তাই সুন্দর নাম রেখে নামের একটি অংশ ধরে তাকে ডাকাই সংগত।

আকীকাহ সন্তানের অধিকার। ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সন্তানের আকীকাহ সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

আদর সন্তানের অধিকার। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বড়োদের আদর সোহাগ লাভ করার একটি প্রচণ্ড চাহিদা থাকে শিশুমনে। এই চাহিদা পূরণ না হলে শিশু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। বিশেষ করে আম্মার আদর শিশুকে মানসিক ভারসাম্য অর্জনে দারুণভাবে সাহায্য করে। এই বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বিশেষ করে আম্মা সজাগ থাকা প্রয়োজন।

দুই বছর পর্যন্ত আম্মার বুকের দুধ পানের অধিকার রয়েছে শিশুর। গোড়া থেকেই শিশুকে আম্মার বুক থেকে বঞ্চিত করা ও তাকে কৌটার দুধের ওপর

নির্ভরশীল করার অর্থ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন রূপে গড়ে তোলা। এটি শিশুর প্রতি বড়ো রকমের যুল্‌ম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন,

مَامِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلٰى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ -

আবু হুরাইরাহ (রা), সহীহ মুসলিম।

"প্রত্যেক শিশুই স্বভাব দীনের (অর্থাৎ ইসলামের) ওপর জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর তার আব্বা-আম্মা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা কিংবা অগ্নিপূজক বানায়।"

শিশুকে ইসলামের ওপরই বর্ধিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা আব্বা-আম্মার কর্তব্য। মনে রাখা প্রয়োজন, পারিবারিক শিক্ষার ছাপ একজন মানুষের গোটা জীবনকেই কোন না কোনভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

সন্তানকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রেও আব্বা-আম্মাকে বিজ্ঞজনোচিত ভূমিকা পালন করতে হবে। ধমকানো ও মারপিট করা শিক্ষা দানের উত্তম উপায় নয়। উৎসাহ দান ও আগ্রহ সৃষ্টি করার মাধ্যমে সন্তানকে সুশিক্ষিত করার প্রয়াস চালাতে হবে। তবে সন্তান যদি কোন অন্যায় কাজ করে বসে তাকে শাসন করার অধিকারও আব্বা-আম্মার রয়েছে।

আব্বা-আম্মা দুইজনই যদি বহির্মুখী হন সন্তানকে সাহচর্য দেবেন কে? অথচ শিক্ষার অন্যতম শক্তিশালী উপায় হচ্ছে সাহচর্য দান। সেই জন্যই মহান আল্লাহ আম্মাকে বহির্মুখী কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে গৃহে অবস্থান করে সন্তানদেরকে সাহচর্য দানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতিটি বিধানই কল্যাণকর। সন্তানের আম্মা সম্পর্কে তিনি যেই বিধান দিয়েছেন অবশ্যই এটিও কল্যাণকর। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব।

প্রসংগত কন্যা সন্তান সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হয়। পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান উভয়ই আল্লাহর দান। উভয়ই আব্বা-আম্মার আদর-সোহাগ পাওয়ার হকদার। জাহিলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তানকে অবজ্ঞা করা হতো। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আব্বার চেহারা মলিন হয়ে যেতো। এই সম্পর্কে আল কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْمٌ ـ

আন্ নাহল ॥ ৫৮

"তাদের কেউ যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ পেতো তার চেহারা কালো হয়ে যেতো। সে ক্ষুব্ধ হতো, মনে দুঃখ অনুভব করতো।"

নিঃসন্দেহে এই ধরনের আচরণ নিন্দনীয়। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) সুসংবাদ দিয়েছেন,

مَنْ ابْتُلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْئٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهٗ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ ـ

আয়িশাহ (রা), সহীহ মুসলিম, সহীহ আল বুখারী।

"যেই ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের কারণে পরীক্ষায় নিপতিত হয়ে তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করে তারা আখিরাতে তার ও জাহান্নামের মাঝখানে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে।"

একজন খাঁটি মুমিন কোন অবস্থাতেই পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারেন না। উভয়কে তিনি সমান নজরে দেখবেন। উভয়ের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করবেন। এটাই ইসলামের দাবি।

৪. বোনের সাথে ভালো ব্যবহার

ভাই ও বোন একই আব্বা-আম্মার সন্তান। ছোটবেলা তারা একত্রে খাওয়া-দাওয়া উঠা-বসা ও খেলাধুলা করে। একে অপরের সহযোগী হয়ে কাজ করে। ভাই বড়ো হলে ছোট বোনকে কোলে পিঠে তুলে আদর করে। বোন বড়ো হলে ছোট ভাইকে কোলে কাঁখে তুলে আদর করে। ভাই অসুস্থ হলে বোন তার পাশে বসে সেবা করে। বোন অসুস্থ হলে ভাই তার সেবা করে। এইভাবেই কেটে যায় ভাই ও বোনের ছোটবেলা।

যুবক হয়ে ভাই বিয়ে করে। আবার যুবতী বোনেরও বিয়ে হয়ে যায় অন্যত্র। এইভাবে ভাই ও বোনের অবস্থান স্থল ভিন্ন হয়ে যায়। তাদের পরিমণ্ডলও আলাদা হয়ে যায়।

কোন কোন ভাবীকে দেখা যায় স্বামীর বোনকে বাঁকা চোখে দেখতে ও অনাদর করতে। স্বামী অসতর্ক ব্যক্তি হলে স্ত্রীর কথায় প্রভাবিত হয়ে বোনের সাথে দুর্ব্যবহার করতেও দেখা যায়। ইসলাম আত্মীয়দেরকে সম্মান করতে নির্দেশ

দেয়। উপরোক্ত আচরণ ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মৃত আব্বা-আম্মার সম্পদ-সম্পত্তিতে ভাই ও বোনকে নির্ধারিত অধিকার দান করেছেন। তিনি বলেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِـدَانِ

وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ـ আন্ নিসা ॥ ৭

"পুরুষদের জন্য তাদের আব্বা-আম্মা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে প্রাপ্য রয়েছে। মহিলাদের জন্য তাদের আব্বা-আব্বা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে প্রাপ্য রয়েছে। তা অল্প হোক বা বেশি। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।"

আব্বার ইন্তিকালের পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ-সম্পত্তি তাঁর পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হারে বণ্টিত হওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের দেশে এক আজগুবী ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। যার ফলে পৈতৃক সম্পত্তি ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। বোনদের প্রাপ্য তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয় না। বরং বলা হয় যে, তোমরা তো মাঝে মধ্যে আমাদের এখানে বেড়াতে আসবে, তাই তোমাদের সম্পত্তি আমাদের কাছেই থাক। কিন্তু এক ভাই যে অপর ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে যায়, কিংবা ভাই যে বোনের বাড়িতে বেড়াতে যায় সেই জন্য তো অপর ভাইয়ের কাছে কিংবা বোনের কাছে সম্পত্তি রাখা হয়না। আসলে এটি একটি খোঁড়া যুক্তি। একটা অজুহাতে বোনের সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে রেখে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এইভাবে বোনদের সম্পত্তি নিজের দখলে রাখা ও ভোগ করা জাহান্নামের আগুন পেটে পুরার শামিল।

আমাদের দেশের সামাজিক পরিবেশ এমন যে বোনেরা ভাইদের এই অন্যায় পদক্ষেপের প্রতিবাদ করতে সাহস পায়না। কোন বোন যদি তার প্রাপ্য দাবি করে সেই বোনকে ভালো নজরে দেখা হয়না। সেই কারণে বোনেরা অধিকার বঞ্চিত হয়েও নীরবে তা বরদাশত করে।

কোন বোন যদি কঠিন ঠেকায় পড়ে তার প্রাপ্য সম্পত্তি বিক্রয় করতে চায় তখন সাধারণত ভাইয়েরাই সেই সম্পত্তি কিনে নেয়। এখানেও বোনদেরকে ঠকানো হয়। বোনকে ন্যায্য মূল্য দেয়া হয়না। প্রচলিত মূল্যের অনেক কম মূল্যে তার কাছ থেকে সেই সম্পত্তি কিনে নেয়া হয়। এই অন্যায়কেও বোন মুখ বুজে

বরদাশত করতে বাধ্য হয়।

ভাইদের পক্ষ থেকে বোনদের প্রতি কৃত এই ধরনের আচরণ খুবই গর্হিত, নিন্দনীয়। কোন খাঁটি মুসলিম বোনদের সাথে এই ধরনের আচরণ করতে পারেন না।

৫. কাজের লোকের সাথে ভালো ব্যবহার

গৃহকেন্দ্রিক কাজের পরিধিও ব্যাপক। প্রতিদিনই নানা ধরনের কাজ আঞ্জাম দিতে হয় গৃহের পরিবেশে। গৃহকর্ত্রী এইসব কাজ সামলিয়ে থাকেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা একটু বড়ো হয়ে উঠলে তারাও নানা কাজে তাঁকে সহযোগিতা করে থাকে। তারপরও বহু কাজ এমন থাকে যেইগুলোতে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। সেই জন্যই রাখতে হয় কাজের লোক।

অকারণে কেউ কাজের লোক রাখেন না। এদেরকে না রেখে সারতে পারলে কেউ কাজের লোক রাখতেন না। তাদেরকে ছাড়া চলে না বলেই তাদেরকে রাখা হয়। তারা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ও উপকারী।

কিন্তু কোন কোন পরিবারে কাজের লোকের প্রতি অমানবিক আচরণ করা হয়। কারণে অকারণে তাদেরকে ধমকানো হয়, বকাঝকা করা হয়। কেউ কেউ তো তাদেরকে মারপিটও করে থাকেন। কাজের লোকের জন্য আলাদা পাতিলে নিকৃষ্ট মানের চালের ভাত রাঁধা হয়। পরিবারের সকলে ফলফলারী খেলেও তাদেরকে তা খেতে দেয়া হয়না। তাদেরকে অত্যন্ত নিম্নমানের পোষাক পরতে দেয়া হয়। তাদের জন্য মশারীর ব্যবস্থা করা হয়না। তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখানো হয়। মাঝে মধ্যে যে তাদের ছুটির প্রয়োজন, সেই দিকেও খেয়াল রাখা হয় না। কাজের লোকের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য আমরা আদিষ্ট। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন,

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ ـ

আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা), সুনানু ইবনু মাজাহ।

"অধীন ব্যক্তিদের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন,

اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ

مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَيُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَايُغْلِبُــهُ فَـاِنْ كَلَّفَـهُ مَايَغْلِبُـهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ ـ

আবু হুরাইরাহ (রা), সহীহ মুসলিম, সহীহ আল বুখারী।

"এরা তোমাদের ভাই, এদেরকে আল্লাহ তোমাদের অধীন করেছেন। যেই ভাইকে আল্লাহ তোমাদের কারো অধীন করেছেন সে তাকে তা-ই খাওয়াবে যা সে নিজে খায়, এমন পোষাক পরাবে যা সে নিজে পরে। এমন কাজ তার ওপর চাপাবে না যা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি এমন কাজ করতে দেয়া হয়, তাহলে সেই কাজে তাকে সহযোগিতা করবে।"

মোটকথা, যাদের সহযোগিতা ছাড়া আমরা চলতে পারিনা তাদের সাথে আমাদেরকে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তাদের ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে হবে। উপদেশ দ্বারা তাদেরকে ত্রুটিমুক্ত করার প্রয়াস চালাতে হবে। তাদেরকে ভালো পোষাক পরাতে হবে। ভালোভাবে থাকতে দিতে হবে। নিজেরা যা খাবো তা-ই তাদেরকে খেতে দিতে হবে। তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তদুপরি তাদেরকে ভালো মুসলিমরূপে গড়ে তোলার জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬. প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার

কোন ব্যক্তির আবাসস্থলের চারদিকে যারা বসবাস করে তাদেরকে প্রতিবেশী বলে। প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা ইসলামী জিন্দেগীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

وَاللّٰهُ لاَيُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لاَيُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لاَيُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ لاَيَـأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ ـ

আবু হুরাইরাহ (রা), সহীহ মুসলিম, সহীহ আল বুখারী।

"আল্লাহর কসম, সে ঈমান পোষণ করেনা, আল্লাহর কসম, সে ঈমান পোষণ করেনা, আল্লাহর কসম, সে ঈমান পোষণ করেনা।" বলা হলো : "কে, ইয়া রাসূলাল্লাহ?" তিনি বললেন, "সেই ব্যক্তি যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَايُؤْذِىْ جَارَهٗ -

"যেই ব্যক্তি আল্লাহর ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেনো তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارَهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ -

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা), মিশকাত।

"সেই ব্যক্তি মুমিন নয় যে পেট পুরে খায় ও তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।"
একদিন এক ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) বললো,

اِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلٰوتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ اِنَّهَا تُؤْذِىْ جِيْرَانَـــهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِىَ فِى النَّارِ - قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ فَـاِنَّ فُلَانَـةً تُذْكَـرُ قِلَّـةُ صَلٰوتِـهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَاِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاِقِطِ وَلَاتُؤْذِىْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَـــهَا قَالَ هِىَ فِى الْجَنَّةِ -

আবু হুরাইরাহ (রা), মিশকাত।

"অমুক মহিলা তার নফল সালাত, সাউম ও সাদাকাহর জন্য সুপরিচিত। কিন্তু সে তার জিহ্বা দ্বারা তার প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তার ঠিকানা জাহান্নাম।" সে আবার বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, অমুক মহিলা সম্পর্কে বলা হয় সে নফল সালাত, সাউম ও সাদাকাহ কম করে। পনিরের সামান্য টুকরা দান করে। কিন্তু সে তার জিহ্বা দ্বারা তার প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তার ঠিকানা জান্নাত।"

একবার আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন,

"প্রতিবেশীর অধিকার হচ্ছে : সে রোগাক্রান্ত হলে তুমি তাকে দেখতে যাবে, সে মারা গেলে জানাযায় শরীক হবে, সে অভাবে পড়লে তাকে সাহায্য করবে, সে বিপদে পড়লে তাকে রক্ষা করবে, তার কোন খুশীর ব্যাপার ঘটলে তাকে

অভিনন্দন জানাবে, সে দুর্যোগের শিকার হলে তাকে সান্ত্বনা দেবে, এমনভাবে ঘর বানাবে না যাতে তার ঘরে বাতাস যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং যদি তাকে কিছু অংশ দিতে না পার তাহলে তোমার খাদ্যের সুঘ্রাণ দ্বারা তাকে কষ্ট দেবে না।" (তাবারানী)

প্রতিবেশীদের মাঝে দীনী ইলমের আলো পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যেও আমরা আদিষ্ট। একদিন ভাষণ দেয়াকালে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "কিছু লোকের কি হয়েছে যে তারা প্রতিবেশীদের নিকট জ্ঞান বিতরণ করে না, তাদেরকে ইসলামের বিধান শিক্ষা দেয় না, তাদেরকে সদুপদেশ দেয় না, সৎ কাজের আদেশ করে না ও অসৎ কাজ থেকে তাদেরকে নিষেধ করে না? কিছু লোকের কি হয়েছে যে তারা তাদের প্রতিবেশীদের নিকট থেকে দীনী ইলম হাছিল করে না, উপদেশ গ্রহণ করে না? আল্লাহর কসম, যারা তাদের প্রতিবেশীদের নিকট দীনী ইলম বিতরণ করে না, তাদেরকে ইসলামের বিধান শিখায় না, সদুপদেশ দেয় না, সৎ কাজের আদেশ করে না ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না, সদুপদেশ গ্রহণ করে না– আমি সাবধান করছি যে তাদেরকে অবশ্যই দুনিয়াতেই আযাব ভোগ করতে হবে।" (তাবারানী)

৭. মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার

বাড়িতে মেহমান এলে হাসিমুখে সালাম বিনিময় করে মুসাফাহা করে তাদেরকে রিসিভ করা ইসলামের শিক্ষা। অতঃপর সামর্থ অনুযায়ী তাদের ভালোভাবে মেহমানদারী করা কর্তব্য।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ ـ

আবু হুরাইরাহ (রা), সহীহ মুসলিম, সহীহ আল বুখারী।

"যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী তার উচিত মেহমানের কদর করা।"

আল্লাহর রাসূল (সা) আরো বলেন,

...وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ لَهٗ صَدَقَةٌ وَلَايَحِلُّ لَهٗ اَنْ يَّثْوِىَ عِنْـدَهٗ حَتّٰى يُحْرِجَهٗ ـ

খুয়াইলিদ ইবনু আমর (রা), সহীহ মুসলিম, সহীহ আল বুখারী।

"মেহমানদারী তিনদিন। এর পর মেহমানের জন্য যা করা হবে তা সাদাকাহ বলে গণ্য হবে। মেহমানের পক্ষে মেজবানের কাছে বেশি দিন অবস্থান করে তাকে পেরেশানীতে ফেলা বৈধ নয়।"

অবশ্য এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও রয়েছে। কোন কোন মেহমান তো পরিবারের সদস্যতুল্য।

ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান। মেহমানদারীর ক্ষেত্রেও ইসলাম চমৎকার ভারসাম্যপূর্ণ বিধান উপস্থাপন করেছে। ইসলাম মেহমানকে সাদরে গ্রহণ করা ও তাঁর কদর করার সুমহান শিক্ষা দিয়েছে মেজবানকে। পক্ষান্তরে মেহমানকেও মেজবানের ওপর যেনো বোঝা হয়ে না যান সেই বিষয়ে তাঁকে সচেতন করেছে।

আরো এক ধরনের মেহমান আছেন যাঁরা কাছাকাছি অবস্থান করেন ও যখন তখন আসতে পারেন। এদের দ্বারাও মেজবান কোন কোন সময় বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে পারেন। সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এঁদের সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নীতি পেশ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ لاَ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَمُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ط

আল আহ্যাব ॥ ৫৩

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করোনা, খাওয়ার সময়ের অপেক্ষায় থেকোনা। যদি তোমাদেরকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয় তখন এসো। অতঃপর খাওয়া শেষ হয়ে গেলে উঠে যাও ও কথাবার্তায় মশগুল হয়ে বসে থেকোনা।"

এই নির্দেশ শুধুমাত্র নবীর ঘরের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো না। নবীর ঘরে প্রথম এই নিয়ম চালু হয় যা পরে মুসলিমদের সাধারণ কৃষ্টিতে পরিণত হয়।

আল কুরআন ও আল হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী মেজবান হিসেবে মেহমানের প্রতি ও মেহমান হিসেবে মেজবানের প্রতি সদাচরণ করা আমাদের কর্তব্য।

৮. সাধারণভাবে ছোটদের সাথে বড়োদের ও বড়োদের সাথে ছোটদের ব্যবহার

আমাদের ছোট ভাই-বোন ও আপন সন্তান ছাড়া আত্মীয় স্বজনের ও পাড়া-পড়শীর সন্তানদের সাথে আমাদের প্রায়ই দেখা-সাক্ষাত হয়। মহানবীর (সা) অনুসরণে তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য।

আম্মা-আব্বা ছাড়াও বয়োজ্যেষ্ঠ আরো অনেকের সাথেই আমরা সম্পর্কিত। আমাদের বড়ো ভাই-বোন, চাচা, মামা, খালু, খালা, ফুফু, ফুফা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, প্রতিবেশী, শিক্ষক ও অন্যান্য প্রবীণ ব্যক্তি আমাদের শ্রদ্ধেয়। তাঁদের সাথে মার্জিতভাবে কথা বলা ও ভদ্র আচরণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

এই সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীসই আমাদের প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفُ شَرَفَ كَبِيْرِنَا ـ

আমর ইবনু শুয়াইব (রা), সুনানু আবী দাউদ, জামে আত্‌তিরমিযী।

"যেই ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ করেনা ও বড়োদের মর্যাদা দিতে জানেনা সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

৯. উপসংহার

একে অপরের সাথে ভালো ব্যবহার করা আমাদের দীনী কর্তব্য। আল্লাহর আদালতে অন্যান্য বিষয়ের মতো এই সম্পর্কেও আমরা জিজ্ঞাসিত হবো। অতএব এক্ষুণি এই বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

পর্দার আসল রূপ

১। মহিলারা প্রয়োজনে ভিন্ পুরুষের সাথে কথা বলবেন, কিন্তু মিহি স্বরে বলবেন না।

আল্লাহ বলেন,

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا -

(আলআহ্যাব ॥ ৩২)

"ওহে নবীর স্ত্রীরা, তোমরা তো অন্য কোন মহিলার মতো নও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে মিহি স্বরে কথা বলো না যা অন্তরে ব্যাধি আছে এমন লোককে প্রলুব্ধ করবে, বরং সোজা-স্পষ্ট কথা বল।"

ইসলাম মহিলাদেরকে প্রয়োজনে ভিন্ পুরুষের সাথে কথা বলার অনুমতি দিয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীরা বহু পুরুষের কাছে দীনী বিষয় বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু প্রয়োজন নেই এমন ক্ষেত্রে মহিলাদের কণ্ঠস্বর ভিন্ পুরুষকে শুনানো অপছন্দ করা হয়েছে। সেই জন্যই মহিলাদেরকে আযান দিতে দেয়া হয়নি। সালাতে ইমাম ভুল করলে পুরুষদেরকে "আল্লাহু আকবার" কিংবা "সুবহানাল্লাহ" উচ্চারণ করে লোকমা দিতে বলা হয়েছে। মহিলাদেরকে বলা হয়েছে হাতের ওপর হাত মেরে শব্দ সৃষ্টি করে লোকমা দিতে।

উপরোক্ত আয়াতটি পর্দার বিধান সংক্রান্ত অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াত। এই আয়াত ও পরবর্তী আরো কয়েকটি আয়াতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। "কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে সকল মুসলিম পরিবারের সংশোধন। নবীর (সা) স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন নবীর (সা) ঘর থেকে এই পবিত্র জীবন ধারার সূচনা হবে তখন অন্য সকল মুসলিম পরিবারের মহিলারা আপনা আপনি তা অনুসরণ করতে থাকবে। কারণ এই ঘরই তো ছিলো তাঁদের জন্য আদর্শ ঘর।"

দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ), (সূরাহ আলআহযাব, টীকা-৪৬)।

২। মহিলাদের কর্তব্য হচ্ছে গৃহাংগনেই অবস্থান করা, সাজ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ানো নয়।

আল্লাহ বলেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا–

(আলআহযাব ॥ ৩৩)

"তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর, পূর্বতন জাহিলিয়াহর ধাঁচে সাজ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়োনা। সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে চল। আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে– নবী পরিবার থেকে– ময়লা দূর করতে ও তোমাদেরকে পুরোপুরি পাক-পবিত্র করতে।"

"আল্লাহ মহিলাদেরকে যেই কার্যধারা থেকে বিরত রাখতে চান তা হচ্ছে, তাদের নিজেদের সাজ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে ঘর থেকে বের হওয়া। তিনি তাদেরকে আদেশ দেন, নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। কারণ তোমাদের আসল কাজ রয়েছে ঘরে, বাইরে নয়। কিন্তু যদি বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে এমনভাবে বের হয়োনা যেমন জাহিলী যুগে মহিলারা বের হতো। প্রসাধন ও সাজসজ্জা করে, সুশোভন অলংকার ও আঁটসাট বা হালকা মিহিন পোষাকে সজ্জিত হয়ে, চেহারা ও দেহের সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে, গর্ব ও আড়ম্বরের সাথে চলা কোন মুসলিম সমাজের মহিলাদের কাজ নয়। এইগুলো জাহিলিয়াহর রীতিনীতি। ইসলামে এই সব চলতে পারে না।" দ্রষ্টব্য ঃ তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ), সূরাহ আলআহযাব, টীকা-৪৯।

৩। কোন মহিলার কাছে কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

... وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط

(আলআহযাব ॥ ৫৩)

"এবং যখন তাদের কাছে (নবীর স্ত্রীদের কাছে) কিছু চাইতে হয় তা চাও পর্দার আড়াল থেকে। এটি তোমাদের ও তাদের মনের জন্য পবিত্রতম পদ্ধতি।"

"এই নির্দেশ আসার পর নবীর (সা) স্ত্রীদের ঘরের দরজায় পর্দা লটকিয়ে দেয়া হয়। আর যেহেতু নবীর (সা) ঘর ছিলো সকল মুসলিমের জন্য আদর্শ ঘর তাই সেই ঘরের অনুকরণে তাঁরা নিজেদের ঘরের দরজায় পর্দা লটকিয়ে দেন।" দ্রষ্টব্য ঃ তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ), সূরাহ আলআহযাব, টীকা-৯৮।

৪। মহিলাদের ঘরে তাঁদের আব্বা, তাঁদের ছেলে, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, ঘনিষ্ঠ মহিলারা ও মালিকানাধীন ব্যক্তিরা (দাস-দাসী) প্রবেশ করতে পারবে।

আল্লাহ বলেন,

لاَجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ اٰبَائِـهِنَّ وَلاَ اَبْنَائِـهِنَّ وَلاَ اِخْوَانِـهِنَّ وَلاَ اَبْنَـاءِ اِخْوَانِـهِنَّ وَلاَ اَبْنَاءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلاَ نِسَـائِهِنَّ وَلاَ مَلَكَـتْ اَيْمَانُـهُنَّ ج وَاتَّقِيْـنَ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَـانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا–

(আলআহযাব ॥ ৫৫)

"তাদের আব্বা (চাচা, মামা, দাদা, দাদার আব্বা, নানা, নানার আব্বা শামিল), তাদের ছেলে (নাতি, নাতির ছেলে, দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে শামিল), তাদের ভাই (বৈপিত্রেয়, বৈমাত্রেয় ও দুধ ভাই শামিল), তাদের ভাইয়ের ছেলে (তাদের নাতি ও নাতির ছেলে শামিল), তাদের বোনের ছেলে (তাদের দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে শামিল), তাদের ঘনিষ্ঠ (মেলামেশার) মহিলারা ও তাদের মালাকানাধীন ব্যক্তিরা তাদের ঘরে প্রবেশ করলে কোন দোষ নেই।"

৫। মহিলারা তাঁদের পরিহিত জিলবাবের (বড়ো চাদরের) একাংশ তাঁদের চেহারার দিকে ঝুলিয়ে দেবেন।

আল্লাহ বলেন

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِـنْ جَلاَبِيْبِـهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَيُؤْذَيْنَ ط

(আলআহযাব ॥ ৫৯)

"ওহে নবী, তোমার স্ত্রীদেরকে, মেয়েদেরকে ও মুমিনদের মহিলাদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের জিলবাবের একাংশ ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেয়। এটি অধিক উপযুক্ত পদ্ধতি যাতে তাদেরকে চেনা যায় ও কষ্ট দেয়া না হয়।"

এই আয়াত জিলবাব পরিধানের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত নয় বরং পরিহিত জিলবাবের একটি অংশ ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেবার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, এই আয়াত নাযিলের পূর্বেই মুসলিম মহিলারা জিলবাব পরা শুরু করেছেন। আর যাঁরা জিলবাব পরতেন তাঁরা শুধু নবীর (সা) স্ত্রীরাই ছিলেন না, সকল মহিলাই এই কাজে শামিল ছিলেন। "নিসাইল মু'মিনীন" বলে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই আয়াতে। এই আয়াত আরো প্রমাণ করে যে পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে নবীর (সা) স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে পর্দা সংক্রান্ত যেইসব বিধান নাযিল করা হয়েছে সেইগুলোও মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত সকল মহিলার জন্যই প্রযোজ্য।

উল্লেখ্য যে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর মুসলিম মহিলারা জিলবাব পরিধান না করে ঘর থেকে বের হতেন না এবং জিলবাবের একাংশ দিয়ে তাঁরা তাঁদের চেহারা ঢেকে পর পুরুষের দৃষ্টি থেকে হিফাজাত করতেন। এই বিষয়ে নারীশ্রেষ্ঠা উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহর (রা) আমল উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে বিদ্যমান।

আয়িশাহ (রা) ছিলেন তাফসীরবিদ, হাদীসবিদ ও ফিকাহবিদ। আলকুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। ইসলামী জীবন বিধানের অনেক কিছু মুসলিম উম্মাহ তাঁর মাধ্যমেই জানতে পেরেছে। তাঁর সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ اٰسِيَةُ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ-

(আবু মূসা আলআশ্‌য়ারী রা., সহীহ আলবুখারী)

"পুরুষদের অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছে। মহিলাদের মধ্যে তা অর্জন করেছেন মারইয়াম বিনতু ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়াহ। আর যাবতীয় খাদ্যের ওপর যেমন সারীদের (এক প্রকার উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাদ্য) মর্যাদা, সকল নারীর ওপর তেমন মর্যাদা আয়িশাহর।"

এই নারীশ্রেষ্ঠা আয়িশাহ (রা) তাঁর পরিহিত জিলবাবের একাংশকে নিকাব বা চেহারার আবরণ বানিয়ে নিতেন।

বানুল মুস্তালিক যুদ্ধ শেষে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মাদীনায় ফেরার পথে এক মানযিলে সৈন্যদেরকে নিয়ে বিশ্রাম করেন। সেই সফরে উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। বেশ রাত থাকতেই কাফিলা সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নেয়। এই সময় আয়িশাহ (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য একটু দূরে যান। প্রয়োজন সেরে হাওদাজে ফিরে এসে দেখেন তাঁর হার গলায় নেই। হার খুঁজতে তিনি হাওদাজ ছেড়ে চলে যান। এই দিকে কাফিলা রওয়ানা হয়ে যায়। লোকেরা তাঁর হাওদাজ উটের পিঠে বসিয়ে দেয়। কিন্তু তারা টেরই পায়নি যে তিনি হাওদাজে বসা নেই। কাফিলা চলে গেলে তিনি এ স্থানে ফিরে এসে বসে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। সাহাবী সাফওয়ান ইবনু মুয়াত্তাল আস্‌সুলামী (রা) সৈন্য বাহিনীর পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রাত্রি শেষে রওয়ানা হয়ে সকাল বেলা ঐ স্থানে এসে পৌছেন যেখানে আয়িশাহ (রা) ঘুমিয়ে ছিলেন। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আয়িশাহ (রা) বলেন,

فَعَرَفَنِيْ حِيْنَ رَأنِيْ وَكَانَ قَدْ رَأنِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيْ فَخَمَرْتُ وَجْهِيْ بِجِلْبَابِيْ-

"তিনি আমাকে দেখেই চিনে ফেলেন। কারণ পর্দার বিধান প্রবর্তনের পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে চিনতে পেরেই তিনি বিস্মিত হয়ে উচ্চারণ করেন "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" তাঁর কণ্ঠস্বর আমার কানে যেতেই আমি জেগে উঠি ও আমার চাদর দিয়ে আমার চেহারা ঢেকে ফেলি।" (সহীহ মুসলিম, সহীহ আলবুখারী, মুসনাদে আহমাদ)

৬। কেউ গৃহবাসীদের সম্মতি না পেয়ে ও তাদেরকে সালাম না জানিয়ে কারো ঘরে প্রবেশ করবেন না।

আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

(আন্‌নূর ॥ ২৭)

"ওহে যারা ঈমান এনেছো, নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে গৃহবাসীদের সম্মতি না পেয়ে ও তাদেরকে সালাম না জানিয়ে প্রবেশ করোনা। এটি তোমাদের জন্য উত্তম বিধান। আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।"

৭। গৃহে কাউকে না পেলে বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করবেন না।

আল্লাহ বলেন,

... فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج ...

(আন্‌নূর ॥ ২৮)

"সেখানে কাউকে না পেলে বিনা অনুমতিতেই তাতে প্রবেশ করো না।"

৮। গৃহবাসীদের পক্ষ থেকে যদি বলা হয়, "এখন চলে যান", চলে আসতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

... وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ–

(আন্‌নূর ॥ ২৮)

"আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় "এখন যান" তাহলে ফিরে যাবে। এটি তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ নীতি। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।"

৯। লোক বসবাস করে না এমন ঘরে কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রী থাকলে তা আনার জন্য সেই ঘরে প্রবেশ করা যাবে।

আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ–

(আন্‌নূর ॥ ২৯)

"এমন ঘরে প্রবেশ করা তোমাদের জন্য দোষের নয় যেখানে কেউ বাস করে না অথচ সেখানে কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রী রয়েছে। আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর ও যা কিছু গোপন কর আল্লাহ সবই জানেন।"

১০। মুমিন পুরুষেরা তাঁদের দৃষ্টি সংযত রাখবেন।

আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ م بِمَا يَصْنَعُوْنَ–

(আন্নূর ॥ ৩০)

"মুমিন পুরুষদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজাত করে। এটি তাদের জন্য বিশুদ্ধ নীতি। তারা যা কিছু করে আল্লাহ্ তা জানেন।"

আপন স্ত্রী কিংবা কোন মুহাররাম মহিলাকে ছাড়া অপর কোন মহিলাকে নজর ভরে দেখা কোন পুরুষের জন্য জায়েয নয়। একবার নজর পড়া ক্ষমাযোগ্য। আবার নজর দেয়া ক্ষমাযোগ্য নয়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এই ধরনের দেখাকে চোখের যিনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, "মানুষ তার ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে যিনা করে থাকে। দেখা হচ্ছে চোখের যিনা। ফুসলানো কণ্ঠের যিনা। তৃপ্তির সাথে পর নারীর কথা শুনা কানের যিনা। হাত দ্বারা স্পর্শ করা হাতের যিনা। অবৈধ উদ্দেশ্যে পথ চলা পায়ের যিনা। যিনার এই সব অনুসঙ্গ পালিত হওয়ার পর লজ্জাস্থান তাকে পূর্ণতা দান করে কিংবা পূর্ণতা দান করা থেকে বিরত থাকে।"

(সহীহ মুসলিম, সহীহ আলবুখারী, সুনানু আবী দাউদ)

উল্লেখ্য যে কোন কোন তাত্ত্বিক ব্যক্তি এই আয়াতটিকে সামনে রেখে বলতে চান যে মহিলাদের চেহারাই যদি খোলা না থাকে তাহলে তো এই আয়াতটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। মহিলাদের চেহারা খোলার রাখার অনুমতি আছে বলেই পুরুষদেরকে দৃষ্টি সংযত রাখতে বলা হয়েছে। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যকে শক্তিশালী করার জন্য বিদায় হাজের সময়ে সংঘটিত দুইটি ঘটনাকেও তাঁদের পক্ষে ব্যবহার করার প্রয়াস চালান। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, মহিলারা তাঁদের চেহারা ঢেকে রাখবেন বটে, কিন্তু তাঁদের চোখ তো আবরণমুক্ত থাকবে। ফলে চোখাচোখির ব্যাপার ঘটতে পারে। তদুপরি অমুসলিম মহিলারা তো তাদের চেহারা খোলাই রাখবে। অতএব দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ অবশ্যই অর্থহীন

নয়। বিদায় হাজের সময় সংঘটিত ঘটনা দুইটি এই ভাইদের বক্তব্য শক্তিশালী করে না। বরং তাঁদের বিরুদ্ধে বুমেরাং হয়।

প্রথম ঘটনা

“বিদায় হাজের সময় নবীর (সা) চাচাতো ভাই আলফাদল ইবনুল আব্বাস (তিনি তখন একজন উঠতি-তরুণ) মাশআরুল হারাম থেকে ফেরার পথে নবীর (সা) সাথে উটের ওপর বসা ছিলেন। পথে মহিলারা যাচ্ছিলো। আলফাদল তাদেরকে দেখতে লাগলেন। নবী (সা) তাঁর মুখের ওপর হাত রেখে তাঁর মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন।”

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রা), (সুনানী আবী দাউদ)

দ্বিতীয় ঘটনা

“আল খাসয়াম গোত্রের একজন মহিলা পথে রাসূলুল্লাহকে (সা) হাজ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন করেন। আলফাদল ইবনুল আব্বাস (রা) এক দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকেন। নবী (সা) তাঁর মুখ ধরে তাঁর মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন।”

(সহীহ আলবুখারী, জামে আত্ তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ)

নবী (সা) দুইবারই উঠতি-তরুণ আলফাদল ইবনুল আব্বাসের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন, কিন্তু মহিলাদেরকে তাঁদের চেহারা ঢেকে নিতে বলেননি।

কারণ?

এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইংগিতেই ইতিপূর্বে তিনি মহিলাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ইহরাম পরিহিতা মহিলারা নিকাব পরবেন না। উপরোক্ত ঘটনা দুইটিতে মহিলারা ছিলেন হাজযাত্রী ও ইহরাম পরিহিতা। কাজেই আলফাদল ইবনুল আব্বাসের (রা) দৃষ্টির মুকাবিলায় তিনি তাঁদেরকে তাঁদের চেহারা ঢাকার নির্দেশ দেননি।

লক্ষ্য করুন। ইহরাম পরিহিতা মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

... وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْاَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنَ–

(আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা., সহীহ আলবুখারী)

"ইহরাম পরিহিতা মহিলা নিকাব পরবে না ও হাত মোজা পরবে না।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

... وَلاَ تَتَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ–

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা), (জামে আত্ তিরমিযী)

"ইহরাম পরিহিতা মহিলা নিকাব পরবে না ও হাত মোজা পরবে না।"

اِنَّه سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَنْهَى النِّسَآءَ فِيْ اِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرَسُ وَالزَّاعَفْرَانِ مِنَ الثِّيَابِ–

(আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা., সুনানু আবী দাউদ)

"তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) ইহরাম পরিহিতা মহিলাদের হাত মোজা, নিকাব, ওয়ারাস ও জা'ফরান রঞ্জিত পোষাক পরিধান নিষেধ করতে শুনেছেন।"

১১। মুমিন মহিলারা তাঁদের দৃষ্টি সংযত রাখবেন।

আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ–

(আন্নূর ॥ ৩১)

"মুমিন মহিলাদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজাত করে।"

উল্লেখ্য যে "মহিলাদের জন্যও পুরুষদের মতো দৃষ্টি সংযত রাখার বিধান দেয়া হয়েছে। তবে পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে তেমন কড়াকড়ি নেই যেমন কড়াকড়ি মহিলাদেরকে দেখার ব্যাপারে পুরুষদের ওপর আরোপিত হয়েছে। এক মাজলিসে মুখোমুখি বসে দেখা নিষিদ্ধ। পথ চলার সময় কিংবা দূর থেকে কোন জায়েয খেলা দেখতে গিয়ে পুরুষদের ওপর দৃষ্টি পড়া নিষিদ্ধ নয়। আর কোন যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিলে একই বাড়িতে থাকা অবস্থায় দেখলে কোন ক্ষতি নেই।... তবুও মহিলারা নিশ্চিন্তে পুরুষদেরকে দেখতে থাকবে ও তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকবে, এটা কোনক্রমেই জায়েয নয়।"

দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ), সূরাহ আন্নূর, টীকা-৩১।

১২। মহিলারা ভিন্ পুরুষের সামনে তাদের সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ করবেন না। যা আপনা আপনি প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা ক্ষমাযোগ্য।

আল্লাহ বলেন,

... وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا– (আন্নূর ॥ ৩১)

"তারা (মুমিন মহিলারা) যেন তাদের সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তা ছাড়া যা আপনা আপনি প্রকাশ হয়।"

اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (ইল্লা মা যাহারা মিন্হা)

আয়াতাংশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মত পার্থক্য রয়েছে ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে। কেউ কেউ এই আয়াতাংশে চেহারা খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) এই আয়াতাংশের যেই জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ পেশ করেছেন তা অসাধারণ। তিনি বলেন, "প্রকাশ হওয়া" ও "প্রকাশ করার" মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আমরা দেখি আলকুরআন "প্রকাশ করা" থেকে বিরত রেখে "প্রকাশ হওয়ার" ব্যাপারে অবকাশ দিচ্ছে। এই অবকাশকে "প্রকাশ করা" পর্যন্ত বিস্তৃত করা আলকুরআনের বিরোধী এবং এমন সব হাদীসেরও বিরোধী যেইগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে নবীর (সা) যুগে আলহিজাবের নির্দেশ আসার পর মহিলারা (চক্ষুদ্বয় ছাড়া) চেহারা খুলে চলতেন না, আলহিজাবের হুকুমের মধ্যে চেহারার পর্দাও শামিল ছিলো এবং ইহরাম ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় নিকাবকে মহিলাদের পোষাকের একটি অংশে পরিণত করা হয়েছিলো।" দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ), আন্নূর, টীকা-৩৫।

১৩। মহিলারা তাঁদের উড়না দিয়ে তাঁদের বুক ঢেকে রাখবেন।

আল্লাহ বলেন,

... وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوْرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ– (আন্নূর ॥ ৩১)

"এবং তারা যেন তাদের উড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে।"

১৪। মহিলারা তাঁদের স্বামী, তাঁদের আব্বা, তাঁদের শ্বশুর, তাঁদের ছেলে, তাঁদের স্বামীর ছেলে, তাঁদের ভাই, তাঁদের ভাইয়ের ছেলে, তাঁদের বোনের ছেলে, তাঁদের ঘনিষ্ঠ স্ত্রীলোক, তাঁদের মালিকানাধীন ব্যক্তি, কামনাহীন অধীন পুরুষ ও নারীদের গোপন বিষয় বুঝে না এমন বালকের সম্মুখে ছাড়া তাঁদের সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ করবেন না।"

আল্লাহ বলেন,

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْنِسَائِهِنَّ اَوْمَامَلَكَتْ
اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا
عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ– (আন্‌নূর ॥ ৩১)

"তারা তাদের সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না তাদের স্বামী, তাদের আব্বা, তাদের শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইয়ের ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের ঘনিষ্ঠ স্ত্রীলোক, তাদের মালিকাধীন ব্যক্তি, কামনাহীন অধীন পুরুষ ও নারীদের গোপন বিষয় বুঝে না এমন বালকের সম্মুখে ছাড়া।"

"এই সীমিত গন্ডির বাইরে যারাই আছে তাদের সামনে মহিলাদের সাজ-সৌন্দর্য ইচ্ছাকৃতভাবে বা বে-পরোয়াভাবে নিজেই প্রকাশ করা উচিত নয়, তবে তাঁদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিংবা তাঁদের ইচ্ছা ছাড়াই যা প্রকাশ হয়ে পড়ে কিংবা যা গোপন করা সম্ভব না হয় তা আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য।" দ্রষ্টব্যঃ তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ), সূরাহ আন্‌নূর, টীকা-৩৭।

১৫। মহিলারা এমনভাবে পা মেরে চলবেন না যাতে তাঁদের লুকানো সাজ-সৌন্দর্যের কথা লোকেরা জেনে ফেলে।

আল্লাহ্ বলেন,

.. وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا
اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– (আন্‌নূর ॥ ৩১)

"এবং তারা যেন তাদের পা এমনভাবে না মেরে চলে যাতে তাদের লুকানো সাজ-সৌন্দর্যের কথা লোকেরা জেনে ফেলে। আর মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।"

১৬। মালিকানাধীন ব্যক্তি ও না-বালেগ সন্তানেরা তিনটি সময়ে অনুমতি না নিয়ে গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করবে না।

আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ م بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ قف ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ م بَعْدَهُنَّ ط

(আন্নূর ॥ ৫৮)

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের মালিকানাধীন ব্যক্তি ও না-বালেগ সন্তানেরা তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসা উচিত ঃ সালাতুল ফজরের আগে, দুপুরে যখন তোমরা পোষাক ছাড় ও সালাতুল ইশার পরে। এই তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়। অন্য সময় তারা তোমাদের কাছে এলে তোমাদের ও তাদের কোন দোষ নেই।"

১৭। সন্তানেরা বালেগ হয়ে গেলে সকল সময় বড়োদের মতোই অনুমতি নিয়ে আব্বা-আম্মার কক্ষে প্রবেশ করতে হবে।

আল্লাহ্ বলেন,

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط

(আন্নূর ॥ ৫৯)

"আর তোমাদের সন্তানেরা যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তাদের তেমনি অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসা উচিত, যেমন তাদের বড়োরা অনুমতি নিয়ে আসে।"

প্রত্যক্ষভাবে অনুমতি না চেয়ে এমন কোন সম্বোধন বা শব্দও যদি উচ্চারণ করে যার দ্বারা বুঝা যায় যে সে নিকটে আসতে চায় সেটাও অনুমতি চাওয়া বলেই গণ্য হবে।

প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, "তোমরা তোমাদের আম্মা ও বোনদের কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও।" (ইবনু কাসীর)।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রা) স্ত্রী যায়নাবের (রা) বর্ণনা থেকে জানা যায় যে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) তাঁর ঘরে প্রবেশ করার সময়ও এমন কোন আওয়াজ করতেন যাতে বুঝা যেতো যে তিনি আসছেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। (ইবনু জারীর)

১৮। বৃদ্ধারা যদি সাজ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁদের চাদর নামিয়ে রাখেন এতে কোন দোষ নেই। তবে বৃদ্ধারাও যদি লজ্জাশীলতা অবলম্বন করেন সেটাই তাঁদের জন্য উত্তম।

আল্লাহ্ বলেন,

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ م بِزِيْنَةٍ ط وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ–

(আন্নূর ॥ ৬০)

"আর যেই সব বৃদ্ধা বিয়ের আশা রাখে না তারা যদি সাজ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছাড়া নিজেদের চাদর নামিয়ে রাখে এতে কোন দোষ নেই। তবে তারা যদি লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে সেটাই তাদের জন্য উত্তম।"

"আলকাওয়া'য়েদু মিনা ন্নিসায়ে" অর্থ হচ্ছে "বসেপড়া মহিলারা।" অর্থাৎ এমন বয়সে পৌছে যাওয়া মহিলাগণ যেই বয়সে তাঁদের সন্তান জন্ম দেবার যোগ্যতা থাকে না, তাঁদের নিজেদের যৌন কামনা অবশিষ্ট থাকে না এবং তাঁদেরকে দেখে পুরুষদের মধ্যেও যৌন বাসনা সৃষ্টি হয় না।

এমন বৃদ্ধাদেরও সাজ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিজেদের চাদর নামিয়ে রাখার অনুমতি নেই। তবে সাজ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকলে তাঁদের চাদর নামিয়ে রাখার অনুমতি আছে।

১৯। উপসংহার

(ক) আল্লাহর খালীল ইবরাহীমের (আ) স্ত্রীর পর্দা

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط قَالَ سَلٰمٌ ج قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ– فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَآءَ

بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ– فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلاَتَأْكُلُوْنَ– فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ط قَالُوْا لاَ تَخَفْ ط وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ– فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهُ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ–

(আয্‌যারিয়াত ॥ ২৫-২৯)

তারা তার (ইবরাহীমের) নিকটে আসলো ও বললো ঃ "আপনার প্রতি সালাম।" সে বললো ঃ "আপনাদের প্রতিও সালাম।" অপরিচিত লোক। অতঃপর সে নীরবে পরিবারের লোকদের কাছে গেলো। পরে একটা মোটা তাজা (ভুনা) বাছুর এনে মেহমানদের সামনে রাখলো। সে বললো ঃ "আপনারা খাচ্ছেন না যে।" সে মনে মনে ভয় পেয়ে গেলো। তারা বললো ঃ "ভয় পাবেন না।" এবং তারা তাকে এক জ্ঞানবান পুত্র সন্তানের জন্ম সম্পর্কে সুসংবাদ দিলো। এই কথা শুনে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে এগিয়ে এলো। সে গালে চপেটাঘাত করতে করতে বললো, "বুড়ীবন্ধ্যা।"

একশ্রেণীর মানুষ এই ঘটনাকে ভিত্তি করে প্রমাণ করতে চান যে ইবরাহীমের (আ) যামানায় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ছিলো এবং ইবরাহীমের স্ত্রী পর্দা না করেই মেহমানদের সামনে এসেছিলেন।

কিন্তু ঘটনাটির দিকে একটু গভীর দৃষ্টি দিলে কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

এক. ইবরাহীম (আ) একাই এগিয়ে গিয়ে সালাম জানিয়ে মেহমানদের রিসিভ করেন। তাঁর স্ত্রী সারাহ্ তাঁর সাথে এগিয়ে গিয়ে মেহমানদেরকে সালাম জানিয়ে অভ্যর্থনায় অংশ নেননি।

দুই. ইবরাহীম (আ) বাড়ির ভেতরে গিয়ে একটি মোটা তাজা বাছুর ভুনা করার ব্যবস্থা করেন।

তিন. বাছুর ভুনা হয়ে গেলে তিনি তা এনে মেহমানদের সামনে পেশ করেন। এই কাজে তাঁর স্ত্রী সংগ দেননি।

চার. মেহমানরা যখন (ফিরিশতা বলে) নিজেদের পরিচয় দিলেন এবং ইবরাহীমের (আ) স্ত্রী সারাহ্‌র গর্ভে ইসহাকের (আ) জন্মের আগাম সংবাদ দিলেন তখন সারাহ্ ভেতর থেকে ফিরিশতা মেহমানদের সামনে নিজের বন্ধ্যাত্বের জন্য আফসোস করতে করতে এগিয়ে এলেন।

অবশ্যই এই ঘটনা প্রমাণ করে না যে ইবরাহীমের (আ) যামানায় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ছিলো এবং সারাহ পর্দা না করেই ভিন্ পুরুষের সামনে আসতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি পর্দা না করে এসেছিলেন ফিরিশতাদের সামনে, কোন মানুষ ভিন্ পুরুষের সামনে নয়। বরং মেহমানরা ফিরিশতা– এই পরিচয় না জানা পর্যন্ত তাঁর তাদের সামনে না আসা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি ভিন্ পুরুষের সাথে পর্দা করতেন।

(খ) আন্নিকাব

"ইবনু হাজার আল্আস্কালানী (রহ) ফাতহুল বারী গ্রন্থে লিখেছেন, "নিকাব মানে উড়নাকে নাক ও চিবুকের উপরে বেঁধে নেওয়া যাতে মুখমন্ডল ঢেকে যায় এবং চোখ খোলা থাকে।"

দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আতাইয়া খামীস প্রণীত "মহিলা ফিকহ" পৃষ্ঠ ঃ ১৬৪।

সুপ্রাচীনকালের কোন্ সময়ে নিকাব ব্যবহার শুরু হয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে নিকাব যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাবের আগেও আরব দেশগুলোতে প্রচলিত ছিলো সেই সম্পর্কে ইসলামী গবেষকদের সুস্পষ্ট অভিমত রয়েছে।

হিন্দুস্থানের আযমগড় থেকে ১৯৫৬ সনে প্রকাশিত "মাকালাত-ই-শিবলী" নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে সম্ভবত ইয়ামানের বানু হিম্ইয়ার সর্ব প্রথম নিকাবের প্রচলন করে। বানু হিম্ইয়ার শাসক পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা নিকাব পরিধান করতেন। পরে তা রাজপরিবারের বাইরের ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে চালু হয়। আরো পরে তা প্রচলিত হয় সর্ব সাধারণের মধ্যে। বানু হিম্ইয়ারের দেখা-দেখি অন্যান্য আরব গোত্রেও নিকাব পরিধানের নিয়ম চালু হয়।

উল্লেখ্য যে ঈসার (আ) জন্মেরও ১১৫ বছর আগে বানু হিম্ইয়ার ইয়ামানে নিজেদের কর্তৃক স্থাপন করে। তাদের রাজধানীর নাম ছিলো যাইদান।

আরো পরবর্তী সময়ে পুরুষরা নিকাব ছেড়ে দেয়। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে তা চালু থাকে। জাহিলিয়াহর যুগে আরবে অবস্থিত উকাযের মেলায় যেই সব মহিলা যোগদান করতো তাদের চেহারায় নিকাব থাকতো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আলহিজাবের যেই সব বিধান চালু করেন তার মধ্যে মহিলাদের নিকাব পরার বিধানও অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

শাহাদাত নাজাতের সহজ পথ

প্রথম প্রকারের শাহাদাত : মৌখিক শাহাদাত

একজন মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে অপরাপর মানুষের কাছে এই কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-দর্শন ও জীবন-বিধানই সত্য। এই জীবন দর্শন ও জীবন-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক সকল জীবন-দর্শন ও জীবন-বিধান মিথ্যা। মুখের ভাষায় এই কর্তব্য পালনেরই নাম মৌখিক শাহাদাত।

দ্বিতীয় প্রকারের শাহাদাত : আমালী শাহাদাত

একজন মুমিনের আরো কর্তব্য হচ্ছে, তিনি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন দর্শন মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে আল্লাহ-প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী নিজের জীবন ঢেলে সাজাবেন। তিনি মুখে যেই ইসলামের কথা বলবেন বাস্তব জীবনে সেই ইসলামের প্রতিফলন ঘটাবেন। নিজের কর্মকাণ্ডে ইসলামের এই অনুসৃতিরই নাম আমালী শাহাদাত। উপরোক্ত দুই প্রকারের শাহাদাত সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُـوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ

আলহাজ্জ ॥ ৭৮

"…..তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এই আল কুরআনেও। যাতে রাসূল হন তোমাদের ওপর (সত্যের) সাক্ষ্যদাতা আর তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবগোষ্ঠীর জন্য।"

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُـوْنَ الرَّسُـوْلُ عَلَيْكُـمْ شَهِيْدًا ط

আল বাকারাহ ॥ ১৪৩

"আর এইভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী উম্মাহ বানিয়েছি যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষ্যদাতা হও এবং রাসূল হয় তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা।"

তৃতীয় প্রকারের শাহাদাত : শত্রুর আঘাতে নিহত হওয়া

ইসলাম-বিরোধী শক্তির অতর্কিত হামলায় কিংবা যুদ্ধের ময়দানে স-ঈমান অবিচল ও দৃঢ়পদ থেকে শত্রুর আঘাতে নিহত হওয়ার নামও শাহাদাত।

এই পুস্তিকায় আমি তৃতীয় প্রকারের শাহাদাত সম্পর্কেই আল কুরআন ও আল হাদীসের বক্তব্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

১. মুমিনের জান-মাল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। যুদ্ধের ময়দানে তিনি প্রাণপণ লড়ে থাকেন।

আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَـهُمْ بِـاَنَّ لَـهُمُ الْجَنَّـةَ يُقَـاتِلُوْنَ فِـيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

আত্‌তাওবা ॥ ১১১

"অবশ্যই আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। (দুশমনদেরকে) হত্যা করে ও নিজেরা নিহত হয়।"

২. মুমিন যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে পারেন না।

আল্লাহ বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ. وَمَنْ يُّوَلِّـهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ اِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَمَأْوٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

আল আনফাল ॥ ১৫, ১৬

"ওহে যারা ঈমান এনেছো, যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হও, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না (অর্থাৎ পালিয়ো না)। যুদ্ধ-কৌশল কিংবা নিজ বাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ পিছু হটলে সে আল্লাহর ক্রোধ সাথে নিয়েই পিছু হটে। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর সেটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।"

৩. আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যিনি নিহত হন কিংবা বিজয়ী হন তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

وَمَنْ يُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

আন নিসা ॥ ৭৪

"এবং যেই ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত কিংবা বিজয়ী হয় আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দেবো।"

৪. আল্লাহর পছন্দনীয় দুইটি বিন্দু।

আল্লাহর রাসূলের (সা) একটি হাদীস থেকে জানা যায় দুইটি বিন্দু আল্লাহর অতি পছন্দনীয়। আর সেইগুলো হচ্ছে :

قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِيْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةٌ دَمٍ تُهْرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

আবু উমামাহ (রা), জামে আত্‌তিরমিযী।

"আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনরত অশ্রুবিন্দু ও আল্লাহর পথে নিবেদিত রক্তবিন্দু।"

৫. শহীদ মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করেন না।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ.

আবু হুরাইরাহ (রা), জামে আত্‌তিরমিযী, সুনানু আন্‌-নাসায়ী, সুনানু আদ্‌দারেমী।

"একজন শহীদ হত্যার যন্ত্রণা ততোটুকুই অনুভব করে যতোটুকু তোমরা অনুভব কর চিমটির যন্ত্রণা।"

৬. আল্লাহ মুমিনদের পরীক্ষা ও তাঁদের কিছু সংখ্যককে শাহাদাতের মর্যাদা দেবার জন্য সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।

আল্লাহ বলেন :

اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ج وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ط وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ.

আলে ইমরান ॥ ১৪০

"এখন যদি তোমাদের ওপর আঘাত এসে থাকে, এমন আঘাত তো ইতিপূর্বে তোমাদের প্রতিপক্ষের ওপরও এসেছিলো। এটি সময়ের আবর্তন যা আমি মানুষের মাঝে ঘটিয়ে থাকি। আর আল্লাহ্ জানতে চান তোমাদের মধ্যে কারা (খাঁটি) মুমিন এবং তিনি চান তোমাদের মধ্য থেকে কিছু শহীদ গ্রহণ করতে।"

৭. শাহাদাতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করেন।

আল্লাহ্ বলেন :

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ز وَمَابَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً.

আল আহযাব ॥ ২৩

"মুমিনদের মাঝে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কেউ কেউ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। কেউ কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের নীতি পরিবর্তন করেনি।"

৮. আল্লাহ্ শহীদের আমল বিনষ্ট হতে দেন না।

আল্লাহ্ বলেন :

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ.

মুহাম্মাদ ॥ ৪

"এবং যেইসব লোক আল্লাহর পথে নিহত হয় আল্লাহ্ তাদের কৃত কর্মগুলো নষ্ট হতে দেন না।"

৯. আল্লাহ্ শহীদের সব গুনাহ্ মাফ করে দেন।

আল্লাহ্ বলেন :

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج

আলে ইমরান ॥ ১৯৫

"অতএব যারা একমাত্র আমার জন্যই হিজরাত করেছে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং আমার পথে লড়াই করে নিহত হয়েছে আমি তাদের সব

গুনাহ মাফ করে দেবো এবং তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নিচে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلشَّهِيْدِ كُلَّ ذَنْبٍ اِلاَّ الدَّيْنَ.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা), সহীহ মুসলিম।
"আল্লাহ শহীদের ঋণ ছাড়া আর সব কিছু মাফ করে দেবেন।"

১০. আল্লাহর পথে যিনি নিহত হন কিংবা মারা যান তিনি আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা লাভ করে ধন্য হন।

আল্লাহ বলেন :

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ.

আলে ইমরান ॥ ১৫৭

"এবং তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মারা যাও তোমরা আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা লাভ করবে যা উত্তম, বিরুদ্ধবাদীরা যা সঞ্চয় করে তা থেকে।"

১১. শহীদ আল্লাহর সান্নিধ্যে উত্তম রিয্ক লাভ করে থাকেন।

আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ط وَ

اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

আলহাজ্জ ॥ ৫৮

"এবং যারা আল্লাহর পথে হিজরাত করেছে, অতঃপর নিহত হয়েছে কিংবা মারা গেছে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উত্তম রিয্ক দেবেন। আর আল্লাহই তো সর্বোত্তম রিয্কদাতা।"

১২. আল্লাহ শহীদকে মৃত মনে করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ বলেন :

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ.

فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ لا

আলে ইমরান ॥ ১৬৯, ১৭০

"এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তাঁরা জীবিত ও তাদের রবের নিকট তারা রিয্ক পাচ্ছে। আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে যা কিছু দিয়েছেন তা পেয়ে তারা আনন্দিত।"

১৩. আল্লাহ্ শহীদদের মৃত বলতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্ বলেন :

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ ، بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لاَ تَشْعُرُوْنَ.

আল বাকারাহ ॥ ১৫৪

"এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত অথচ এই সম্পর্কে তোমাদের চেতনা নেই।"

১৪. আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মিসকের সুঘ্রাণ নিয়ে হাশরের ময়দানে হাজির হবেন।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَاِنَّهَا تَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغْزَرِمَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ.

মুয়ায (রা), জামে আত্তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ।

"যেই ব্যক্তি আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে কিংবা যার গায়ে আঁচড় কাটা হয়েছে কিয়ামাতের দিন সে তা তাজা অবস্থায় নিয়ে হাজির হবে। এর রঙ হবে জাফরানী ও সুঘ্রাণ হবে মিসকের।"

১৫. আল্লাহর আদালতে শহীদের কোন জওয়াবদিহিতা নেই।

একজন মুজাহিদ কোন অবস্থাতেই পিছু না হটে অবিরাম লড়াই করে যখন শহীদ হন আল্লাহ্ তাঁর বীরত্ব দেখে হাসেন।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

وَاِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ اِلٰى عَبْدٍ فِىْ الدُّنْيَا فَلاَ حِسَابَ عَلَيْهِ.

না'য়ীম ইবনু হাম্মার (রা), মুসনাদে আহমাদ।

"আর তোমার রব যার ওপর দুনিয়ার জীবনে হাসেন (আখিরাতে) তার কোন হিসাব (জওয়াবদিহিতা) নেই।"

১৬. শ্রেষ্ঠ শহীদ

শ্রেষ্ঠ শহীদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

اَلَّذِيْنَ اِنْ يَلْقَوْا فِيْ الصَّفِّ لاَيَلْفِتُوْنَ وَجُوْهَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلُوْا.

না'য়ীম ইবনু হাম্মার (রা), মুসনাদে আহমাদ।

"শ্রেষ্ঠ শহীদ তো তারা যারা পিছু না হটে (পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে) যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়েছে।"

১৭. শহীদের বাসস্থান

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

اُولٰئِكَ يَنْطَلِقُوْنَ فِيْ الْغُرَفِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ.

না'য়ীম ইবনু হাম্মার (রা), মুসনাদে আহমাদ।

"তারা (শহীদগণ) জান্নাতের অতি উচ্চ ভবনে অবস্থান করবে।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ فَصَعِدَبِيْ الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلاَنِيْ دَارًا هِيَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَقَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالاَ اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ.

সামুরাহ (রা), সহীহ আল বুখারী।

"আমি রাতে (স্বপ্নে) দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট আসতে দেখি। তারা আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠে। তারপর আমাকে নিয়ে যায় একটি ভবনে। সেটি ছিলো অতি সুন্দর। এর চেয়ে সুন্দর ভবন আমি কখনো দেখিনি। তারা দুইজন আমাকে জানালো যে ঐটি হচ্ছে শহীদদের ভবন।"

১৮. শহীদের ছয়টি বিশেষত্ব।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ :

يُغْفَرُ لَهٗ فِيْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ

وَيُرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ

وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

يَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْاَكْبَرِ

وَيُوْضَعُ عَلٰى رَائْسِهٖ تَاجُ الْوَقَارِ

اَلْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنَ

وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقَارِبِهٖ

মিকদাম ইবনু মাদী কারাব (রা), জামে আত্‌তিরমিযী।

"আল্লাহর নিকট শহীদের ছয়টি বিশেষত্ব :

(এক) তার দেহের প্রথম রক্তবিন্দু বের হওয়ার সাথে সাথেই তাকে মাফ করে দেয়া হয় ও জান্নাতে তার অবস্থান স্থল তাকে দেখানো হয়।

(দুই) তাকে কবর আযাব থেকে রেহাই দেয়া হয়।

(তিন) তাকে কিয়ামাতের মহাভীতি থেকে নিরাপদ রাখা হবে।

(চার) তার মাথায় এমন তাজ পরানো হবে যার একটি ইয়াকুত হবে দুনিয়ার সমগ্র সম্পদের চেয়ে অধিক মূল্যবান।

(পাঁচ) বাহাত্তর জন ডাগর চোখওয়ালা হুরকে তার স্ত্রী বানিয়ে দেয়া হবে।

(ছয়) সত্তর জন নিকটাত্মীয়ের জন্য সে শাফায়াত করতে পারবে।"

১৯. শহীদ বার বার দুনিয়ায় এসে শাহাদাত লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবেন।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجَعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهٗ مَاعَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ.

আনাস ইবনু মালিক (রা), সহীহ মুসলিম, সহীহ আল বুখারী।

"যেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে দুনিয়ার সবকিছু তাকে দেয়া হলেও সে আর দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না। ব্যতিক্রম হচ্ছে শহীদ। তাকে যেই সম্মান দেয়া হবে তা দেখে সে দশবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহর পথে লড়াই করে দশবার শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে।"

২০. বিশুদ্ধ নিয়াত শাহাদাত কবুলের পূর্বশর্ত।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَّفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اِسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ.

আবু হুরাইরাহ (রা), সহীহ মুসলিম।

"শেষ বিচারের দিন প্রথম পর্বে এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে যে শহীদ হয়েছে। তাকে (আল্লাহর আদালতে) হাজির করে আল্লাহ-প্রদত্ত সকল নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নিয়ামাত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে : এইসব নিয়ামাত পেয়ে সে কি করেছে। সে বলবে, "আমি আপনার পথে লড়াই করে করে শেষ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করেছি।" আল্লাহ বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি বীর রূপে খ্যাতি অর্জনের জন্য লড়াই করেছো। সেই খ্যাতি তুমি (দুনিয়ায়) পেয়েছো।" অতঃপর তার সম্পর্কে ফায়সালা দেয়া হবে, তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র শাহাদাতই নয় সালাত (নামায), সাউম (রোযা), যাকাত, হাজ, সাদাকাহ (দান), জিহাদ তথা সকল নেক আমল বিশুদ্ধ নিয়াতসহকারে সম্পন্ন না হলে আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। একজন মুমিনের সকল পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার ও সকল নেক কাজ সম্পাদন করার একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তোষ অর্জন।

২১. শাহাদাতের তামান্নার গুরুত্ব।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا اُعْطِيْهَا وَلَوْلَمْ تُصِبْهُ.

আনাস ইবনু মালিক (রা), সহীহ মুসলিম।

“যেই ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শাহাদাত কামনা করে, শহীদ না হলেও তাকে শহীদের মর্যাদা দেয়া হয়।”

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

مَنْ سَئَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَآءِ وَ اِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ.

সাহাল ইবনু হুনাইফ (রা), সহীহ মুসলিম।

“যেই ব্যক্তি সাচ্চা দিলে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করে, ঘরে বিছানায় শায়িত থেকে মারা গেলেও আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দেন।”

২২. আসহাবে রাসূলের শাহাদাতের তামান্না।

আসহাবে রাসূল শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁদের অন্তরে ছিলো শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই জন্য যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা ছিলেন অকুতোভয় বীর। দুইটি ঘটনা এখানে উদাহরণ হিসেবে পেশ করছি।

ক. বদর যুদ্ধের ঘটনা।

মুশরিক বাহিনী বদরে পৌছার পূর্বেই আল্লাহর রাসূল (সা) মুসলিম মুজাহিদদের নিয়ে বদরে পৌছে যান। এরপর মুশরিক বাহিনী সেখানে পৌছে। এই সময় মুসলিমদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন :

قُوْمُوْا اِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ قَالَ يَقُوْلُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْاَنْصَارِىُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَحْمِلُكَ عَلٰى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ رَجَاءَ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ اَهْلِهَا قَالَ فَاِنَّكَ مِنْ اَهْلِهَا فَاَخْرَجَ تَمَرَاتٍ

مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ اَنَا حَيِّيْتُ حَتّٰى اٰكُلَ تَمَرَاتِىْ هٰذِهِ اِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ قَالَ فَرَمٰى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ.

আনাস ইবনু মালিক (রা), সহীহ্ মুসলিম।

"এবার তৈরি হয়ে যাও জান্নাতের জন্য যার বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর সমান।" এই কথা শুনে উমাইর ইবনুল হুমাম আল আনসারী (রা) বললেন : "হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর সমান? তিনি বললেন, "হাঁ।" উমাইর ইবনুল হুমাম বলে উঠলেন, "বাহ্ বাহ্"। আল্লাহর রাসূল বলেন : "এতে অবাক হয়ে বাহ্ বাহ্ বলার কী আছে!" উমাইর ইবনুল হুমাম বললেন, "না, আল্লাহর কসম, এই কথা আমি এই আশায় বলেছি যাতে আমি এর অধিবাসী হতে পারি।" আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "হাঁ, তুমি অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসী হবে।" এই কথা শুনে উমাইর ইবনুল হুমাম তাঁর তীরদানি থেকে কিছু খেজুর বের করে খেতে শুরু করেন। তারপর তিনি বলেন, "এই খেজুরগুলো শেষ করা পর্যন্ত আমি যদি বেঁচে থাকতে চাই সে তো দীর্ঘ সময়।" এই বলে তিনি অবশিষ্ট খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দেন এবং অস্ত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় তিনি শত্রুর আঘাতে শহীদ হয়ে যান।"

খ. উহুদ যুদ্ধের ঘটনা।

আনাস ইবনুন্ নাদার (রা) বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। সেই জন্য তাঁর মনে দারুণ আফসোস ছিলো। উহুদ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে সা'দ ইবনু মুয়াযের সাথে তাঁর দেখা। তিনি বললেন :

يَا سَعَدِ بْنِ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ اِنِّىْ اَجِدُ رِيْحُهَا مِنْ دُوْنِ اُحُدٍ.

"ওহে সা'দ ইবনু মুয়ায, আন্নাদারের রবের শপথ করে বলছি, আমি উহুদের ঐদিক থেকে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি।" অতঃপর তিনি শত্রুদের দিকে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন।

২৩. অন্যান্য প্রকারের শহীদ।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنَ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْـهَدْمِ وَالشَّـهِيْدُ فِـىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

আবু হুরাইরাহ (রা), সহীহ মুসলিম, সহীহ আল বুখারী।

"শহীদ পাঁচ প্রকারের। মহামারীতে মৃত, কলেরায় মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, দেয়াল চাপা পড়ে মৃত ও আল্লাহর পথে লড়াইতে নিহত।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

وَمَنْ مَاتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

وَمَنْ مَاتَ فِىْ الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

وَمَنْ مَاتَ فِىْ الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ.

আবু হুরাইরাহ (রা), সহীহ মুসলিম, সহীহ আল বুখারী।

"যেই ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হলো সে শহীদ, যেই ব্যক্তি আল্লাহর পথে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলো সে শহীদ, যেই ব্যক্তি মহামারীতে মারা গেলো সে শহীদ, যেই ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা গেলো সে শহীদ এবং যেই ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা গেলো সে শহীদ।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা), সহীহ মুসলিম, সহীহ আল বুখারী।

"যেই ব্যক্তি নিজের অর্থ-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে সে শহীদ।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

- আবুল আ'ওয়ার সায়ীদ ইবনু যায়িদ (রা), সুনানু আবী দাউদ, জামে আত্ তিরমিযী।

"যেই ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যেই ব্যক্তি আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যেই ব্যক্তি নিজের দীনের হিফাজাত করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ এবং যেই ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।